# শ্রীসমীরণ সেন

শ্রীবিণায়ক ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক
শ্রীসুশীল দাস গুপ্ত
১৫২-এ, বেলেঘাটা মেন্ রোড,
কলিকাতা।

মাঘ ১৩৪৪
মূল্য
—একটাকা চারি আনা—

মুদ্রাকর—
শ্রীঅবলাকান্ত রায়,
সিদ্ধেশ্বর প্রেস,
৩১৩ শিবনারায়ণ দাসের লেন,
কলিকাতা।

পরম পূজনীয় ও পূজনীয়া

শ্রীযুক্ত হরিচরণ ভট্টাচার্য্য

ও

শ্রীযুক্তা সত্যবতী দেবী

পিতা ও মাতার শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু।

এই আমার প্রথম উপন্যাস।
এর লেখক আমি, কিন্তু এর
আদর্শ পেয়েছি বাইরের থেকে,
এর উৎসাহ পেয়েছি বন্ধু ও
শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে।
তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার
করবার এই অবসর। কবি
হেমেন্দ্রকুমার রায়, ডাক্তার
পশুপতি ভট্টাচার্য্য, ব্যারিষ্টার-
পত্নী মাননীয়া স্নুবর্ণ দেবী, বন্ধুবর
দেবেন্দ্র নারায়ণ বাগ এবং
প্রিয়বন্ধু সুকোমলকান্তি ঘোষ,
এঁদের কাছে আমার আন্তরিক
কৃতজ্ঞতা নিবেদন ক'রে সহৃদয়
পাঠকদের হাতে কম্পিত অন্তঃ-
করণে এই পুস্তক সমর্পণ করছি।

# শ্রীসমীরণ সেন

## [ এক ]

মাত্র সতেরো বছর বয়সে এই গল্পের নায়ক শ্রীসমীরণ সেন আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। সতেরো বছরের এই ছেলেটিকে—সেদিন হাওড়া ষ্টেশনের একটি ট্রেন থেকে কুণ্ঠিত পদে ধীরে ধীরে নামতে দেখা গেল। গায়ে একটি টুইলের টেনিস শার্ট, পরণে আধময়লা একখানি ধুতি আর পায়ে স্যাণ্ডেল। চকিত চোখে চারদিকে চাইতে চাইতে সে গেট্ দিয়ে বেরিয়ে বাইরে বাস্ ষ্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি এসে একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। বেলা তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা।

এই কোলকাতা! কোনখানে এতটুকু ছিদ্র নেই, কোনখানে নেই একটু অবকাশ। হু হু করে বাস্ চলেছে, ট্যাক্সি চলেছে, ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, রিক্সা, প্যাঁ পোঁ, ভ্যাঁ ভোঁ, এই ভীষণতম যন্ত্র-জটিলতার মধ্যে মানুষ চলবে কোনখান দিয়ে? পায়ে হাঁটার রাস্তা নেই নাকি মোটে? অসহায় ভাবে সমীরণ ডাইনে-বাঁয়ে চাইতে লাগলো।

সমীরণ আমাদের দেখতে কুৎসিত নয়—বরং রূপবান্। সুন্দর দুটো বড় বড় ঢল্‌ঢলে চোখ; মাথার ওপর অযত্নবিন্যস্ত চুলগুলি তার মুখের সৌকুমার্য্যই বৃদ্ধি করেছে। সমস্ত চেহারায় একটি সুন্দরী মেয়ের কমনীয়তা। আমরা অবিশ্যি এখনো ওর হাসি দেখিনি, কারণ ও এখন ভয় পেয়েছে, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলতে পারি ও হাসলে আপনারা দেখতে পাবেন ওর ওই টুকটুকে ঠোঁটের নীচে দাঁতের বিন্যাসও প্রথম শ্রেণীর। এ হতেই হবে। না হয়ে উপায় নেই। কারণ ওকে আমার এই উপন্যাসের নায়ক হতে হবে। বেশ ছেলে ওই সমীরণ। চলো সমীরণ, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবেনা, এগোতে হবে।

সমীরণ, তুমি আমাকে হাসালে! এই এতটুকু রাস্তা পার হ'তে গিয়ে চাববার চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলে! তুমি এ অক্ষমতাকে এই সহরে রাখবে কোথায়! এ তোমার পশ্চিম নয়। এ হচ্ছে বাঙলার রাজধানী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সহর! সোজা কথা নয়, বুঝেছ? কথাটা মন দিয়ে ভাবলে তুমি আর এক পাও চলতে পারবেনা সমীরণ! এখানে প্রত্যেকটি দোতলা, তিনতলা, চারতলা বাড়ীর ঘরে ঘরে গিজ্‌গিজ্ করছে মানুষ, তাদের কেউ কারুকে চেনেনা। তারা ন'টার সময় নাকেমুখে ভাত গুঁজে ঊর্দ্ধশ্বাসে ট্রামে উঠে আর একটা তিনতলা কি চারতলা বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢোকে, তারপর সেখান থেকে বেলা পাঁচটার সময় বেরিয়ে আবার নিজের দোতলা কি তিনতলায় এসে ঢোকে। এই হচ্ছে এখানকার সভ্যতা। হেসোনা সমীরণ, তোমার ও পশ্চিমের ফাঁকা আকাশ-টাকাশ এখানে নেই। আর এই নটা-পাঁচটার পরের বৈচিত্র্য হচ্ছে, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া, নবজাত শিশুর

কান্না, মশার ডাক, মাতালের চীৎকার, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, দমকলের দাম্ভিক গর্জ্জন, এ্যাম্বুলেন্সের নিঃশব্দ যাতায়াত, কলার খোসা, আমের খোসা, নাক ডাকার শব্দ···চলো সমীরণ চলো !

এই সেই হাওড়ার পুল। সমীরণ! আশা করি এই—হাওড়ার পুল সম্বন্ধে ব'য়ে পড়ে নিশ্চয় অনেকবার একে দেখতে প্রলুব্ধ হয়েছ তুমি ? চেয়ে দেখ সমস্ত পুলটা কতকগুলো নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাল করে চেয়ে দেখ !···ডাইনে চাও, সারি সারি বিরাটকায় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। ওদের কেউ এসেছে লণ্ডন থেকে, কেউ নিউইয়র্ক, কেউ সাংহাই, আবার কেউ বা কামস্কাট্কা থেকে। ওরাও তোমারই মত—সবে কোলকাতায় এসেছে ! কিন্তু দেখ তোমার মত ভীরু ওরা নয়।··· পেছন থেকে লোকের ভীড় তোমাকে ঠেলছে, না—? সমীরণ, তুমিতো এক সেকেণ্ডও এখানে দাঁড়াতে পারবেনা। এগিয়ে তোমাকে যেতে হবেই ; গন্তব্যস্থান না থাকলেও তোমার গতি বন্ধ করা চলবে না। হাঁটো, হাঁটো, সমীরণ হাঁটো !

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ের কাছে এসে সমীরণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছলো। তারপর রাস্তা পার হয়ে ডাইনে চলতে লাগলো। কী যেন একটা ঠিকানা সে টুকে নিয়েছিল মায়ের পুরাণো এক ডায়েরী থেকে ; সেই ছোট্ট কাগজের টুকরোটিকে হাওড়া ষ্টেশনে নামার পর থেকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। সেটা হারাণোর সঙ্গে সঙ্গে কোলকাতায় আর পরিচিত বলে তার কেউ রইলো না।·· কোথায় যাওয়া যায় ?—সামনে রাত্রি···এটা কি ? পার্ক ? বেশতো বসাই যাক্না একটু ! এক পয়সার ডালমুট কিনে সমীরণ ভেতরে ঢুকে—একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলো।

এই জলটুকু ঘিরে মানুষের ভীড়ের যেন আর অন্ত নেই। ঠিক বোঝাই যায়না—এরা কী চায়! বন্ বন্ করে এইভাবে এই পুকুরটা প্রদক্ষিণ করবার মানেই বা কী? কোলকাতার লোক দেখছি ধীরে সুস্থে কোন কাজই করতে পারে না। বিয়ে বাড়ার ব্যস্ততা ব'য়ে সারাটা জীবন কি কাটানো চলে? সমীরণ ধীরে ধীরে ডালমুট চিবোতে লাগলো।

সন্ধ্যে হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় জ্বলে উঠেছে গ্যাসের আলো। পার্কের লোকগুলো একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে, যেন বাঘে তাড়া করেছে। কোলকাতার মানুষ এরা! এদের স্বতন্ত্র কোন পরিচয় নেই। এরা বাঙালী নয়, হিন্দুস্থানী নয়, মাড়োয়ারী নয়, উড়িয়া নয়, মান্দ্রাজী, পাঞ্জাবী, গুজরাটি এরা কিছুই নয়, এরা শুধু কোলকাতার মানুষ। এরা খায় তাড়াতাড়ি, যায় তাড়াতাড়ি, বলে তাড়াতাড়ি, আর মরে তাড়াতাড়ি।

কিন্তু রাত্রি যে গভীর হতে চললো! আশ্রয় তো একটা চাই। পথেতো আর রাত কাটানো চলবে না! পার্কে অবশ্য ঘুমোনো যায়, কিন্তু যদি পুলিশে ধরে? হাজতে বাস করাব চেয়ে এই রকম ফাঁকা রাস্তায় মোটর চাপা পড়া ঢের বেশী আরামের আর আনন্দের। আচ্ছা—এক কাজ করা যাক্। হাওড়া ষ্টেশনে ফিরে গিয়ে রাত্রিটা সেখানে কাটিয়ে সকালে আবার কোলকাতায় ফিরে আসা যাবে। আশ্চর্য্য! এই আইডিয়াটা এতক্ষণ সমীরণের মনে কেন আসেনি?

ক্লান্তপদে সমীরণ আবার হ্যারিসন রোড দিয়ে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে ফিরে চল্‌লো। অবসাদ আর ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করছে। হাওড়া অবধি পৌঁছনো যাবে কিনা কে জানে!

ঘুমে—নিবিড় ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে। কাছে কোথাও একটা বারান্দা-টারান্দা নেই? এই যে! রেলিং দেওয়া একটা ছোট্ট সরু বারান্দার ওপর সমীরণ ধপ্ ক'রে বসে পড়লো। রাত্রি এগারোটা বাজলো। দেখতে দেখতে কোলকাতা সহরের চেহারা বদল হচ্ছে। লোকজন কমে এল, গাড়ী ঘোড়ার সংখ্যা গেল কমে। চারদিকের দোকান পাট বন্ধ হ'ল। শুধু গ্যাসের ফ্যাকাসে আলোয় সমস্ত রাস্তাটা যেন একটা অনুচ্চারিত হাহাকারের মত বোধ হতে লাগলো।...

ঘুমিয়ে পড়োনা সমীরণ, এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়োনা! চেয়ে দেখ হ্যারিসন রোডের মাথায় চাঁদ দেখা যাচ্ছে! মধ্য রাত্রিতে হ্যারিসন রোডের মাথায় চাঁদ দেখার সুদুলভ সৌভাগ্য আজকে একমাত্র তুমিই লাভ করলে সমীরণ! এখন থেকে যারা এই পথ দিয়ে চলবে তাদের আর কোলকাতার মানুষ বলে ব্যঙ্গ করোনা সমীরণ। তারা সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের মানুষ। তারা সব দেশেই ছিল, কাজেই কোলকাতাতেও আছে। এই জনবিরল প্রশস্ত পথে সরু ট্রাম লাইনের পাশ দিয়ে তারা যাবে এপাড়া থেকে ওপাড়া। লোকের অতিরিক্ত ধন-সঞ্চয়ের ভার লাঘব করতে। সুবিধে পেলে আজ রাত্রে ওরা তোমার কাছেও আসবে।

কাঁদছো সমীরণ! কেন? বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে বুঝি? কিন্তু সেটা কি ঠিক? তুমি এসেছ এই বাংলার রাজধানীতে ভাগ্য পরীক্ষা করতে। কত দুঃখ, কত আঘাত, কত ব্যথা, কত দারিদ্র্য তোমায় এর পরে সহ্য করতে হবে—কাঁদলে কি তোমার চলে? তুমি হচ্ছো আমার এই উপন্যাসের নায়ক। বহু বিচিত্রতম পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমি তোমাকে নিয়ে যাবো; কত

প্রেম, কত বঞ্চনা, কত দীর্ঘনিঃশ্বাসের পথ দিয়ে তোমায় চলতে হবে—শেষ পরিচ্ছেদের অকল্পিত সমাপ্তির দিকে। ছিঃ! চোখ মোছ!

চেয়ে দেখ সমীরণ, হ্যারিসন রোডে চাঁদ উঠেছে! তার জ্যোৎস্না এসে পড়েছে তোমার গায়ে। আজকের এই রাত অক্ষয় হ'য়ে থাকবে তোমার জীবনে। শোন! আমি তোমাকে একটা গল্প বলি। অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য্য এবং অক্ষম একটা প্রেমের গল্প। তোমারই জন্য পৃথিবীতে এই গল্পটির অবতারণা হয়েছিল।...নাঃ, এখনও তুমি ফোঁপাচ্ছ, দেখছি! কেঁদোনা সমীরণ, গল্প শোন!

গর্দ্দানিবাগের নাম শুনেছ? পাটনা-গর্দ্দানিবাগ? অনেক দিন আগে, মানে প্রায় ষোল সতেরো বছর আগে সেখানে একটি ষোল সতেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে বাস করতো, তার নাম ছিল কমলা; রূপে আর গুণে সে ছিল প্রায় কমলারই মত। সে আর তার স্বামী। স্বামী করতো চাকরী আর স্ত্রী দেখতো সংসার। স্বচ্ছল, আনন্দময়, সঙ্কীর্ণ একটি সংসার। সেই সংসারের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তই ছিল রোমাঞ্চিত, আর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ছিল সাবলীল।

স্বামী অফিস থেকে ফিরে ডাকতো—ওগো!

তরল কণ্ঠের জবাব ভেসে আসতো—কি গো!

—আমার কাপড়খানা কোথায় গো?

—আমার জামাটা যেখানে আছে গো!

—আচ্ছা ওতেই হবে। চা হয়েছে?

—হয়েছে।

—খাবার?

—হয়েছে।

—আরো কিছু দেবে?

—দেবো। তুমি ··?

—দেবো।

এই ছিল তাদের দৈনন্দিন দাম্পত্যালাপের প্রণালী। তাতে ছিল না কোন কলহ, ছিল না কোন কাঁটা, ছিল না অভাব, ছিল না কোন কান্না। ভুল বোঝার অস্বস্তিকর সংঘাত কোনদিন বাধেনি তাদের দিন যাপনে।···সুখে কাটছিল জীবন। এমন সময় সে বাড়ীতে কোলকাতা থেকে এলো একটি অতিথি স্বামীর দূর সম্পর্কের এক ভাই,—প্রবাসে চাকরী লাভের বাসনায়। স্বামী-স্ত্রীর সুদীর্ঘ-প্রসারিত যাত্রাপথে এইবার একটা বাঁক দেখা দিলো।

শুনছো সমীরণ! ঘুমিও না, শোন!

এই ভাবে মাস ছয়েক কেটে গেলে দেখা গেল—সেই নবাগত অতিথিটি এই সংসারে বেশ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে সুরু করেছে। প্রথম পরিচয়ের জড়তা তার কেটে গেছে, সে তোমার আমার মতই সহজভাবে পাটনায় চাকরীর চেষ্টায় ঘুরছে। তার এখানে থাকা নিয়ে কমলা স্বামীকে দু-একদিন কিছু বলবো বলবো ক'রেও বলতে পারে নি। কিন্তু এখন আর তার এ লোকটির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। সে তার স্বামীকে যেমন খেতে দেয়—ওকেও দেয়, স্বামীকে যেমন সেবা করে—ওকেও করে; স্বামীকে যেমন ঠাট্টা করে—ওকেও করে।

এর কিছুদিন পরেই স্বামিটির হলো অসুখ। যেমন তেমন অসুখ নয়—ডবল নিউমোনিয়া। কমলার কপালে ছিল আরও

কিছু প্রাপ্তি—তাই স্বামীকে সে বাঁচাতে পারলো না। মৃত্যুর একটু পূর্ব্বে স্বামী তার সেই দূর সম্পর্কীয় ভাইয়ের হাত দুটি ধরে বলে গেল—ওকে দেখো! মানে, কমলাকে দেখো।

এর পরের কিছুদিনের খবর আমি জানিনে। মাস আষ্টেক পরে একদিন সকালে হঠাৎ কমলাকে দেখা গেল—সে তার শোবার ঘরের দেওয়ালে ধাঁই ধাঁই ক'রে মাথা ঠুকছে। ঠিক তার ওপরেই স্বামীর ফটোখানি টাঙান ছিল বলে—অনায়াসে অনুমান করা চলতে পারতো—সে তার স্বামীকে প্রণাম করছে। কিন্তু তাতো নয়, স্পষ্ট শুনতে পাওয়া গেল মাথা ঠুকতে ঠুকতে সে অস্ফুটে বলছে—ঠাকুর! মরণ দাও—মরণ দাও! আর যেন একটা দিনও না বাঁচি! সেদিন সারাদিন সে কারো সঙ্গে কথাও কইল না, খেলও না। শুধু তার শোবার ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে অবিশ্রাম কাঁদতে লাগল। আকুল, মর্ম্মভেদী, বুক-চাপড়ান একটা কান্না..........

আরও কয়েক মাস পরে......

গর্দ্দানিবাগের চওড়া রাস্তাটার একটা ডাষ্টবিনের মধ্যে দেখা গেল একটি সদ্যজাত শিশু শুয়ে শুয়ে হাত পা নাড়ছে; সেদিন সকাল থেকেই সে কী বৃষ্টি! সব ভেঙেচুরে তচনচ ক'রে দেবে যেন! সেই ছোট্ট শিশুর সারাজীবনের কান্না সেদিন যেন বিধাতা একাই কাঁদলেন। কত লোক এল, কত লোক গেল, ঠাট্টা ক'রে, ধিক্কার দিয়ে,—নাক সিঁটকে। শুধু এই বিশাল বিশ্ব-পৃথিবীতে সেই অবাঞ্ছিত শিশু ডাষ্ট-বিনের মধ্যে শুয়ে শুয়ে সেই বিপুল বৃষ্টিধারার মধ্যেও হাসিমুখে তার হাত পা নাড়তে লাগলো।

এমন সময় যাচ্ছিল সেখান দিয়ে একটী সগু-সন্তান-শোকাভিভূতা তরুণী—সঙ্গে তার স্বামী। মেয়েটি ওই শিশুকে দেখবামাত্র ছুটে গিয়ে ডাষ্টবিন থেকে তাকে কোলে তুলে নিলো। চুমোয় চুমোয় আচ্ছন্ন ক'রে দিল তার মুখ। স্বামী বেচারা বোধ হয় একটু দ্বিধা, একটু ইতস্ততঃ করেছিল—কিন্তু ক্রন্দসী স্ত্রীর নিবিড় বাহুবন্ধনে শিশুটীকে দেখে সে আর কোন কথা কইতে পারলো না।

সেইদিন থেকে শিশুটি তার পিতৃপরিচয় পেলো···

সুদীর্ঘ ষোল বছর পরে—

ষোল বছর পরে—সেই শিশুর দিকে চেয়ে আর আমরা তাকে চিন্তে পারছি না। কী অসম্ভব রূপবান সে, কী অদ্ভুত তার চোখ, কী অনুপম তার মুখের রেখা, কী সু-বঙ্কিম তার ভ্রূ।—সে যদি মেয়ে হ'ত—তা হ'লে প্রত্যেকটি কসাই বরের বাপ তাকে বিনামূল্যে নিয়ে যেত, নিজের ভবিষ্যৎ বংশধারাকে রূপের মর্য্যাদা দেবার জন্য···সে যদি গণিকা হ'ত—তা হ'লে পৃথিবীতে আজ আবার আর একটা ট্রয় যুদ্ধ ঘনিয়ে উঠতো।

অনেক কাণ্ড ঘটেছে এর মধ্যে। তার বাপ (বাপই বলি) গেছে মারা, সংসার গেছে দরিদ্র হয়ে। ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা দিয়ে ছেলেটি মায়ের কষ্ট আর দেখতে না পেরে—একদিন চুপি চুপি কারুকে কিছু না বলে,—নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করবার জন্য—কোথায় যেন চলে গেল······।

সমীরণ, গল্পটা লাগলো কেমন তোমার? ঘুমে তুমি চোখ চাইতে পারছো না, এতই কেন তোমার ঘুম! মহানগরীর বিশাল রাজপথ-প্রান্তে তুমি তোমার কাপড়ের প্রান্ত বিছিয়েছ; আমি

জানি তুমি আর দু মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমোবার আগে আর একটি কথা আমার তুমি কাণ পেতে শোন, মাত্র একটি কথা!······গর্দ্দানিবাগের ডাষ্টবিনে কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলেটি —তুমিই! তুমিই সেই ছেলে সমীরণ! হ্যাঁ, আজও তোমার পিতৃপরিচয় নেই। উদার উন্মুক্ত আকাশের ধারা-দাক্ষিণ্যের নীচে তোমাকে পাওয়া গিয়েছিল। কোথায় কোন্ ঘরের নিভৃত-তম অন্ধকারের বুকে কোন অল্পবয়স্কা জননীর অনভিজ্ঞতার যন্ত্রণায় তোমার জন্ম, তা তোমাকে শোনাবার আজ কেউ নেই সমীরণ! তোমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠেনি সমাজের সম্বর্দ্ধনা-শঙ্খ, আত্মীয়-পরিজনের আনন্দিত-কলগুঞ্জনে সেই নবজাত শিশুর ললাট প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেনি। তোমার জন্ম হয়েছে কলঙ্কে ·····ভয়ে······ [illegible]······ লজ্জায়······, পুরুষের পাশবিকতায়, নারীর আত্মদানে; অনিচ্ছায়, উন্মাদনায় আর অভিশাপে। তুমি এই পৃথিবীতে এসেছ বিনা নিমন্ত্রণে। এর উৎসব-অঙ্গনে তাই তোমার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট আসন নেই। তোমার রক্তস্রোতের মধ্যে অহর্নিশ বাজবে সেই সংঘাত; তোমার অন্তরের সুগভীর গোপনে বসে অনন্তকাল কাঁদবে সেই মা, যে তার একান্ত অনিচ্ছায় তোমাকে পৃথিবীতে এনে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করেছিল,—তোমার মস্তিষ্কের কোষে কোষে চিরদিন হাহাকার করবে সেই পুরুষ—যার প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে তুমি পৃথিবীতে এসেছ! তারাও কাঁদবে— তুমিও কাঁদবে। সমীরণ, তুমি পতিতার সন্তান!

ঘুমিয়ে পড়লে? ঘুমাও, সমীরণ ঘুমাও। স্বপ্নহীন হোক্ তোমার রাত্রি, ক্লান্তিহীন হোক তোমার মন। অনাগত অনিশ্চিতের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করবার আগে সুসভ্য রাজধানীর পথ-প্রান্তে একটু-

থানি বিশ্রাম ক'রে নাও। তুমি তো জাননা সমীরণ, কিন্তু আমি জানি, আগামী কাল সমস্ত দিন তোমার কি ভাবে কাটবে।··· একটা চোর এসে পকেট হাতড়ে তোমার শেষ সম্বল কিন্তু নিয়ে গেল সমীরণ! তুমি জানতেও পারলে না? খুবই ক্লান্ত হয়েছ বুঝি? আহা! ধরিত্রীর অনিচ্ছিত অতিথি ঘুমাও। ভোরের সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার তোমার পাশে এসে দাঁড়াব। ঘুমাও!

গুড্ নাইট, মাই চাইল্ড, গুড্ নাইট!

## [ দুই ]

ভোর হ'ল……

একটা ময়লা ঠেলা গাড়ীর বিকট কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ্ শব্দে সমীরণ ঘুম থেকে জেগে উঠলো। ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ কোলকাতা, বড় বড় বাড়ীগুলো এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে, একটু পরেই জেগে উঠে সারাদিনের রুক্ষ-রুটীনে আত্মনিয়োগ করবে।

সমীরণ উঠে দাঁড়িয়ে জামাটা ভাল করে গায়ে দিল। তারপর [illegible]জুতো[illegible]য় মাথার বড় বড় চুলগুলোকে পেছনে ঠেলে দিয়ে সিঁড়ি-[illegible]য়ে নেমে পড়লো। সামনেই একটা জলের কল, সেখানে [illegible] করে মুখ ধুয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ফুটপাথ দিয়ে পূর্ব্ব-দিকে চলতে আরম্ভ করলো।

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় তখনও জন-যান মুখর হ'য়ে ওঠেনি। দোকানগুলো সবে খুলতে আরম্ভ করেছে, ধূপধুনো আর গঙ্গাজল দেবার ধুম পড়ে গেছে। সমীরণ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রাস্তা পার হ'য়ে সোজা দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলো। যাবার যার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নেই, তার চলায় কোন রকম ছন্দও নেই।

বাঁদিকে একটা চায়ের দোকানে ইতিমধ্যেই অসম্ভব ভীড় জমে গেছে। এক কাপ গরম পানীয় পেটে পড়বার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত লোকগুলোর চেহারা কী বি[illegible] আর কী করুণ! চা জিনি-ষটা কিন্তু বেশ! মদের সস্তা সংস্করণও বলা যেতে পারে। সমীরণ পকেটে হাত দিলো।

এ কি ! পয়সা ? তার পয়সা কড়ি কোথায় গেল ? ছোট্ট সেই উলের ব্যাগটা আর তার ভেতর ছিল পাঁচ টাকার একখান নোট আর খুচরো তের আনা পয়সা ! কোথায় গেল ! সমীরণ স্তম্ভিত ভাবে পাশের একটা রেলিং চেপে ধরে নিজেকে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচালো। বোঁ বোঁ ক'রে তার মাথা ঘুরছিল। কোলকাতার বাড়ী, ঘর, গাড়ী ঘোড়া সব কিছু অদৃশ্য হয়ে— চোখের সামনে একটা ভয়ঙ্কর কালো অন্ধকারের পর্দ্দা দুলতে লাগলো

এখন উপায় ? এই নির্ব্বান্ধব দেশে কার কাছে যাবে সে, খাবেই বা আজকে ? চাকরী ! কোথায় চাকরী ? কার বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ তাকে চাকরীই বা দেবে কে ? এ কোন্ বিধাতার পরিহাস আজ তার ভাগ্যের প্রতি ? ফুটপাথে শুয়ে যার রাত্রি কাটে, চোর কি তারও কাছে আসবে ?—

উপায় ? এখন উপায় ? কেবলমাত্র এই একটি শব্দই— সমীরণের মস্তিষ্কের মধ্যে ঝম্‌ঝম্ করে বাজতে লাগলো। পথের কোন লোককে ধরেতো আর বলা যায়না, আমায় একটা পয়সা দিন, চোরে আমার সব চুরী করে নিয়ে গেছে ! রাজধানীর সভ্যতা স্পর্দ্ধী লোক এরা ! মুখ ফিরিয়ে অন্যমনস্কের মত চলে যাবে। ভাববে ভিক্ষুক, ভাববে পেশাদার জোচ্চোর ! তার চেয়ে না খেয়ে শুকিয়ে মরা অনেক ভাল। কিন্তু ..

কিন্তু এই এত বড সহরে সামান্য কয়েকটা পয়সার অভাবে— সে না খেয়ে মরে যাবে, সকলের চোখের সামনে অথচ আড়ালে ; তবু কেউ তার সম্বন্ধে উৎসুক হ'য়ে উঠবেনা,—এইবা কেমন কথা ? —সমীরণ শুনেছে এখানে অনেক ধর্ম্মশালা আছে,—তারাত

খেতে দেয়; কিন্তু সেখানে বোধ হয় কোন বড়লোকের সার্টি-ফিকেট চাই, নইলে দান বন্ধ। সার্টিফিকেটের তারতম্যে দয়ার তারতম্য। বেশ দেশ এই কোলকাতা! আজ যদি সে এখানে না খেয়ে ফুটপাথের ওপর শুয়ে মরে যায় তাহলে শ্মশানে তার শবদেহ নিয়ে যাওয়ার পরও সার্টিফিকেট চাই। নইলে সেই মৃত দেহের কেউ কোন সম্ভ্রম রাখবেনা। হাঁসপাতালে নিয়ে গিয়ে কেটেকুটে তচনচ ক'রে ছাত্রদের শিক্ষার কৌতূহল চরিতার্থ করবে।

বেলা বাড়ছে রৌদ্রের তাপ ক্রমশঃ খরতর হচ্ছে। বাস ট্রামের ভীড় পথ ক্রমশঃ দুর্গম হয়ে উঠছে। মুখে পান, হাতে ছাতা, জুতো। কেরাণীর দল বাদুড় ঝোলা ঝুলতে ঝুলতে চলেছে। সময়ান্তবর্ত্তি-[illegible] পরাকাষ্ঠা! সমীরণ দক্ষিণে—সোজা দক্ষিণে চলতে লাগলো। ধীরে ধীরে এক পা এক পা ক'রে যাবার ইচ্ছা নেই অথচ যেতে হবে তার চলার ভঙ্গীটা প্রায় এই রকমের। এই রকম ভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলবার পর হঠাৎ তার মনে হল সে আর চলতে পারছেনা! গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কাণের মধ্যেটা ভোঁ ভোঁ করছে। জল একটু জল পাওয়া যায়না কোথাও? কোন দোকানে চাইব? সভ্য-রাজধানীর সু-সভ্য দোকান, হয়ত পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেবে। না থাক। আর একটু হাঁটা যাক্!

গ্রীষ্মকাল, দেখতে দেখতে সমস্ত সহর অগ্নিলীলায় উন্মত্ত হ'য়ে উঠলো। ফুটপাথ উঠল তেতে, রাস্তার পিচ্ গেল নরম হ'য়ে; হু হু ক'রে একটা ক্ষ্যাপা দক্ষিণে হাওয়া—সারা সহরের শূন্য ভরে হাহাকার ক'রে ফিরতে লাগলো। জল-জল-জল! বাড়ীর গা

ঘেঁষে ঘেঁষে সঙ্কীর্ণ ছায়াপ্রণালী দিয়ে সমীরণ তখনও টলতে টলতে পথ চলছে। আর মনে মনে উচ্চারণ করছে, জল-জল-জল! হঠাৎ রাস্তার ধারে একটা কল দেখতে পেয়ে সমীরণ উন্মাদের মত গিয়ে সেটা টিপে ধরলো। জল নেই, সাড়ে দশটা বেজে গেছে, নিয়মানুবর্ত্তিতা! মানুষ কি ক'রে মরে এ বিষয় জানতে যদি কারুর কিছুমাত্র আগ্রহ থাকে তবে আজ সমীরণকে দেখবে এস! কি রকম ভাবে একটু একটু ক'রে এই সুন্দর ছেলেটি মৃত্যু কবলিত হচ্ছে, তা একটা দেখবার জিনিষ। এই গ্রীষ্মের আতপ্ত দুপুরে যখন গঙ্গায় জল, কলে জল, দোকানে দোকানে ডাব, ঘোল আর আইসক্রীম সরবতের ছড়াছড়ি, সেখানে এই লাজুক ছেলেটি জল না পেয়ে কেমন করে মরে যাচ্ছে, সারাজীবন ধরে নাতি নাতনীদের গল্প ক'রে শোনাবার মত এ একটা ঘটনা।

ভবানীপুর। সমীরণ ভবানীপুরে এসে গেছে। সামনেই একটা বাড়ীর জানালা দিয়ে একটা বাঁশের চোঙ বেরিয়ে আছে আর তার সামনে একজন লোক অঞ্জলি পেতে দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছে। জ—ল! সমীরণ সেখানে মরীয়ার মত গিয়ে দাঁড়াল। "জল দিন আমায় একটু জল দিন!" তারপর পর্ব্বতের অন্ধকার নেপথ্য থেকে যেমন করে অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করে ঝর্ণা, ঠিক তেমনি ক'রে ঘরের ভিতরকার করুণার ধারা সেই বাঁশের চোঙ বেয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে সমীরণের অঞ্জলির উপর ঝরে পড়তে লাগলো..., আঃ...!

জল খেয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার পর তার সমস্ত শরীরটা যেন একটা অসহ তৃপ্তির স্পর্শে ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো। হাঁটবার আর উৎসাহ নেই। কাল বিকেল থেকে খাদ্যের একটি দানাও তার পেটে পড়েনি। শুধু বর্দ্ধমানে চার পয়সার সীতাভোগ, আর

কলেজ স্কোয়ারে এক পয়সার চানাচুর — এইতো সে খেয়েছে! উঃ আর পারে না সে! ভগবান! জল দিয়েছ - এবার খেতে দাও, সামান্য কিছু খেতে দাও, নইলে আমি মরে যাব!···বড় বয়েই গেল ভগবানের তাতে! ভগবান তো আর ফেরিওলা নন,—তিনি খাদ্য মাথায় ক'রে তোমার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন না! তিনি থাকেন পারিজাত-গন্ধী নন্দন কাননের প্রমোদ হর্ম্ম্যে! বায়ু আর বরুণ তাঁর গ্রীষ্ম নিবারণ করছে, আর উর্ব্বশী মেনকা করছে ব্যজন! তুমি হাঁটো সমীরণ — তুমি হাঁটো···

পাশেই বেঞ্চ। ক্লান্ত সমীরণ সেটার উপর শুয়ে পড়লো। বাতাসটা এইবার যেন আর তত গরম লাগছে না। সামনের দোতলায় কতকগুলি মেয়ে বোধ হয় ক্যারম খেলছে, এখান থেকে তাদের তরল হাস্য-কলোচ্ছ্বাস শোনা যাচ্ছে। স্বামীরা গেছে আফিসে, স্ত্রীরা খেলছে ক্যারম! বেশ আছে এরা, বেশ আছে। ধীরে ধীরে সমীরণের চোখ দুটি ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে এল··

সমীরণ! এই কথাটা তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না যে, কোলকাতা ঘুমোবার জায়গা নয়, এটা জেগে থাকবার জায়গা। চোখ আর কাণ মেলে এখানে তোমাকে জেগে থাকতে হবে। নইলে চোর আসবে, ডাকাত আসবে, বন্ধু আসবে।—হ্যাঁ বন্ধুও আসবে তোমার সর্ব্বনাশ করতে! কোলকাতার বন্ধু তোমার এখনও হয়নি, হলে বুঝবে! এরা আসবে তোমার কাছে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে, আর দৃষ্টি রাখবে তোমার সম্বলের দিকে। জনসমাজে তোমাকে হেয় ক'রে, ঘৃণ্য ক'রে, অপদস্থ ক'রে, তোমাকে বসিয়ে দিয়ে তোমার মাথায় পা রেখে এরা উঠে যাবে সৌভাগ্যের দোতালায়। সাবধান!

সমীরণ, তোমার জন্য চিন্তিত হচ্ছি, তোমার এই সুন্দর চেহারা, অথচ কোলকাতায় এসে তুমি কিছু করতে পারবে না,—রাজধানীর ইতিহাসে এরকম কোন অক্ষম লোকের উল্লেখ নেই। তোমার ওই সর্ব্বনেশে কুমারী সুলভ লজ্জাটা এখানে পরিত্যাগ করতে হবে সমীরণ! নইলে তুমি টিঁকতে পারবে না! চালাক হতে হবে। লোকে তোমার ওই কমনীয় চেহারা দেখে তোমার দিকে আকৃষ্ট হবে, তাদের সেই মুগ্ধতার সুযোগ তুমি নেবে। তোমার চেহারা যে তাদের ভাল লেগেছে এর দাম তুমি নেবে। অবশ্য নেবে!

হাসছো কেন সমীরণ? স্বপ্ন দেখছো বুঝি? পাটনায় নিজের ছোট্ট ঘরখানিতে মায়ের হাতে পাতা ফর্সা বিছানায় শুয়ে পাশের বাড়ীর রেবাকে—স্বপ্ন দেখছো বুঝি? কিন্তু তুমি তো জান, তোমার মা-ই রেবার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে রাজী নন! কারণ রেবা খাঁটি বৈদ্য, আর তুমি –, ওঠো ওঠো জাগো! রসা রোডের ফুটপাথে শুয়ে ওসব স্বপ্ন-বিলাস চলবে না। ওঠো-জাগো! উঠে চেষ্টা করো কোথায় দুটো অন্ন মিলবে, সামনের রাত্রিতে আবার কোন বারান্দায় শুয়ে চাঁদ দেখবে! ওঠো! তোমার জন্য আছে দুঃখ-কষ্ট-বিপদ, তোমাকে করতে হবে অন্ন সংগ্রহের চেষ্টা, রেবা হেনা, ললিতা, মালতী তোমার জন্য নয়। ওঠো…

একটা ফেরিওয়ালার বিশ্রী চীৎকারে, সমীরণ ঘুম ভেঙে বেঞ্চটার ওপর উঠে বসলো। ওঃ! কী ভীষণ চেঁচায় এই কোলকাতার ফেরিওয়ালাগুলো! বেচবিতো আম, তার জন্য এত সোরগোল! আম তো লোকে নিজের গরজেই কিনবে,—এতো আর টঁ্যাপারি নয় যে লোকের প্রয়োজন জাগাবার জন্য

চেঁচিয়ে গলা ফাটাতে হবে !···উঠে দাঁড়াতে গিয়ে সমীরণ আবার ধপ্ করে সেইখানে বসে পড়লো। একী! দুর্ব্বলতায় তার সমস্ত শরীর কাঁপছে যে! চোখের স্বচ্ছ দৃষ্টি ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে উঠছে,—এ তার হ'ল কি ?

কিছুক্ষণ এইভাবে বসে থাকার পর সমীরণ আবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে—অত্যন্ত ধীরপদে আরও দক্ষিণে চলতে সুরু করলো! কিন্তু একটা চৌমাথার মোড়ের কাছে এসে আর সে চলতে পারলো না, একটা বারান্দার এক পাশে চুপ ক'রে বসে রইলো। দোকানে দোকানে কেনা-বেচার ভীড়, রাস্তায় রাস্তায় সুসজ্জিত ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, টামে বাসে তরুণ তরুণী। উৎসবময়ী কোলকাতা! লোকের মুখে মুখে খেলার কথা, সিনেমার কথা, ষ্টেজের কথা, নাচের কথা, গানের কথা ;—এখানে খাওয়ার কথা কেউ বলে না। পথে একটা ভিখিরী দেখলো, হয়তো মুখ ফিরিয়ে চলে গেল, নয়ত ঠং করে একটা আধলা ফেলে দিল। ব্যস্, একেবারে দয়ার শেষ কথা!

সামনেই একটা লোক খণ্ড খণ্ড তরমুজ বিক্রী করছে। ঠাণ্ডা আর মিষ্টি তরমুজ, এক পয়সায় একখানা। কত লোক যে কিনছে! এই গরমের সন্ধ্যায় বেশ লাগে কিন্তু তরমুজ খেতে! তরমুজের সরবৎ আরও ভাল খেতে। বরফ দিয়ে আর সিরাপ দিয়ে খুব বড় এক গ্লাস তরমুজের সরবৎ—আঃ! নিঃসংশয় হবার জন্য সমীরণ আবার পকেটে হাত দিলো। নাঃ, একটাও নেই, স-ব চুরি হয়ে গেছে।

সারাদিনের পর এইবার—এতক্ষণ পরে এই অসহায় ছেলেটির দু' চোখের কোল ভরে জল জমে উঠলো, একটু পরেই সে জল

টপ্ টপ্ ক'রে নাকের পাশ দিয়ে, গালের উপর দিয়ে, মুখ আর চিবুক বেয়ে বুকের জামার কাছে ঝরে পড়তে লাগলো।... সাহায্য করবার লোক নেই, খাবার একটা পয়সা নেই, দাঁড়াবার একটু স্থান নেই, কি করবে সে? আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে—জলঝড় এলো বলে—কি করবে সে? এই অসংখ্য নরনারীর মধ্যে কোন লোককে বললে তার ঠিক লোককে বলা হবে? ভিক্ষে? না, মরে গেলেও সে কারু কাছে হাত পেতে দাঁড়াতে পারবে না। কেন, লোকের কি চোখ নেই? লোকে কি দেখতে পাচ্ছে না তার এই ক্লান্ত শুষ্ক চেহারা? তারা কি বুঝতে পারছে না যে, সে এখনও না খেয়ে সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে? না যদি বুঝতে পারে তবে সমীরণ বল্লেই যে বুঝবে তারই বা কি মানে আছে?...সমীরণ হু হু করে কাঁদতে লাগলো।

কান্নার মৃদু শব্দে তরমুজওয়ালা একবার ফিরে চেয়ে আবার কাজে মন দিলো; পথ চলতি দু' একটি ভদ্রলোক খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কিছুই বুঝতে না পেরে আবার হাঁটতে সুরু করলো। দু' একটি আধুনিক যুবক পথ চলতে চলতে বলে গেল—'ভিক্ষের কত রকম কায়দাই যে বেরুচ্ছে। ন্যূসেন্স!' সমীরণ কারুর দিকে চাইলো না, কোন কথা বললো না, শুধু দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে নিঃশব্দে হু হু ক'রে কাঁদতে লাগলো।

এমন সময় এলো ঝড়। ধুলো-বালি উড়িয়ে, গাছ-পালা কাঁপিয়ে, এলো প্রচণ্ড ঝড়। নিমেষে তরমুজওয়ালা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, পথভরা লোকজন ভোজবাজীর মত কোথায় মিলিয়ে গেল, শুধু অতবড় চওড়া রাস্তাটার বুকের ওপর দিয়ে ক্রুদ্ধ দৈত্যের মত গোঁ গোঁ গোঁ গোঁ ক'রে একটা উন্মত্ত ঝড় গর্জ্জন

ক'রে ফিরতে লাগলো, আর তারি পথপ্রান্তে একটা বারান্দায় বসে আমাদের সমীরণ কাঁদতে লাগলো··· ।

অদ্ভুত সাবজেক্ট! কেউ যদি শিল্পী থাকো, এসো,—আমি তোমাকে একটা আশ্চর্য্য ছবির খোরাক দেবো। রাজধানীর ঘরে ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করে লোকে সভয়ে জপ করছে যখন ইষ্ট দেবতার নাম, বাড়ীর কোন ছেলে এসময় বাইরে থেকে গেল কিনা জানবার জন্য যখন চীৎকার করছে ভয়ার্ত্তা জননীর দল, দুরন্ত ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য যখন প্রত্যেকেই তাদের প্রিয়জনকে নিজের ঘরে ডেকে নিচ্ছে; তখন পথের দিকে চেয়ে দেখ—সমীরণ কাঁদছে! ওকে ডেকে নেবার কেউ নেই বলে ও বাইরেই থেকে গেল। অন্ধকার আকাশের নীচে কাঁদছে ঝড়, আর গাড়ী-বারান্দার নীচে কাঁদছে সমীরণ! আঁকো শিল্পী—এঁকে নাও! রাখো তোমার মোনালিসা আর ভেনাসের আদর্শ—দূর কর মাথা থেকে কল্পিত ল্যাণ্ডস্কেপের মাঠ, নদী, ঝরণা! এই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে সমীরণকে নিরাপদ আশ্রয়ে ডেকে নেবার কেউ নেই, সে কাঁদছে, আঁকো তাকে! আঁকো তার চোখের জল, আঁকো ঝড়ের ভ্রুকুটি। চোখে আঙুল দিয়ে মানুষকে দেখিয়ে দাও, পৃথিবীতে তার অবস্থানের মূল্য। তুমি শিল্পী—এ কাজ তোমার!

ঝড়ের বেগ একটু কমতেই ঝম্ ঝম্ ক'রে নামলো বৃষ্টি। সে কী বৃষ্টি! আকাশ ভাঙ্গা একটা দিশেহারা প্লাবন। দেখতে দেখতে পথের উপর জল জমে উঠলো। বাতাসের বেগে জলের ছাট এসে সমীরণকে আপাদমস্তক ভিজিয়ে দিল। কান্না এখন আর তার নেই, সে শুধু স্তব্ধ হ'য়ে প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলা

উপভোগ করছিল ! কোথায় গেছে এখন তোমার তৈরী করা সভ্যতা, তোমার ট্রাম আর তোমার মানুষ ! হো হো ক'রে এই ঝড় আর জল একটা বন্য আদিম হাসি হাসছে সমস্ত রাজধানীর শূন্য ভ'রে। পথের যতদূর চোখ চলে কেবল জল আর জল। দেখতে দেখতে সমীরণের মুখে একটা ক্ষীণ হাসি ভেসে উঠলো। কিসের সে হাসি তা বোধ হয় এক সে ছাড়া আর কেউ জানে না।

সমীরণ এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি, আর একটি সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় এতক্ষণ তার পেছনেই চুপ ক রে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বৃষ্টিটা একটু ধরে আসতেই তিনি সমীরণের কাছে এগিয়ে এলেন। তিনি বোধ করি অনেকক্ষণ থেকেই ওকে লক্ষ্য করছিলেন, তাই কাছে এসেই ধীরে ধীরে ওর হাতটি নিজের হাতে তুলে নিলেন—

—তুমি কোথায় যাবে বাবা ?

সমীরণ একেবারে চমকে উঠলো ! মানুষ যে মানুষের সঙ্গে এমন ভাবে কথা কইতে পারে, এ যেন সে ভুলেই গেছলো। কতকাল কেউ তাকে এমন ভাবে প্রশ্ন করেনি। প্রথমটায় তাই কোন জবাবই সে দিতে পারলো না। শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে বিমূঢ়ের মত ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইল !

—তুমি কাঁদছিলে কেন ? স্নিগ্ধ-কণ্ঠে তিনি জিগ্যেস করলেন।

—কই না তো ! ফট্ ক'রে সমীরণ বলে বসলো।

—হ্যাঁ। যখন ঝড়টা এলো, আমি স্পষ্ট দেখেছি, হাঁটুর মধ্যে তুমি মুখ গুঁজে কাঁদছিলে। কি হয়েছে বলবে না আমাকে ?

সমীরণের বুভুক্ষু মনটা আর একবার হাহাকার ক'রে উঠলো।

বলতেই তো,—বলতেই তো সে চায়। শুধু এই একটি কথা বলবার জন্যই না সে আজ পাগলের মত সারা কোলকাতা হেঁটে বেড়িয়েছে! উত্তর দিতে গিয়ে সমীরণের ঠোঁটদুটি শুধু একবার নড়ে উঠলো।

—বল! ভদ্রলোক আবার বললেন।

—আমি—আমি কাল রাত্তির থেকে কিছু খাইনি; তাই—। আবার সমীরণ কাঁদে বুঝি!

—খাওনি? কী আশ্চর্য্য? কেন?

—চোরে আমার সব পয়সা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে।

—বটে! তা' কোলকাতায় কি তোমার বাড়ী নয়?

—না, আমার বাড়ী পাটনায়।

—পাটনায়? এখানে পরিচিত কেউ আছেন?

—না।

—তবে কোন সাহসে তুমি কোলকাতায় এলে? সমীরণ চুপ ক'রে রইল।

—কেন এলে কোলকাতায় বলতে বাধা আছে?—

—না। চাকরীর চেষ্টায়—

—চাকরী! ভদ্রলোক উচ্চহাস্য ক'রে উঠলেন।—চাকরী! এইটুকু ফুটফুটে ছেলে তুমি; চাকরীর তো তোমার এখন বয়েসই হয়নি। আচ্ছা এস আমার সঙ্গে। কোন ক্লাস অবধি পড়েছ?

—ম্যাট্রিক পাশ করেছি এবার।

—বেশ, বেশ, লেখাপড়াও কিছু শিখেছ দেখছি তাহ'লে! আচ্ছা এস আমার সঙ্গে। সমীরণ নিঃশব্দে তাঁর পেছনে চলতে লাগলো…

গিরীশ মুখার্জ্জীর রোডে একখানা তেতলা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে ভদ্রলোক ডাকলেন,—বড়বৌ! দেখবে এস. পথে আজ একটা মজার জিনিষ কুড়িয়ে পেয়েছি! ওপর থেকে তৎক্ষণাৎ—সাড়া এলো—যাই—যাই! কি পেলে গো? হীরে মুক্তোটুক্তো নয়তো?

—প্রায় তাই। এসই না নীচে একবারটি!

—যাই।

একটু পরে যিনি নীচে নেমে এলেন, তাঁর বয়স বছর ছত্রিশের বেশী হবেনা। পাঁচ বছর আগেও যে তিনি অপরূপ সুন্দরী ছিলেন—মুখে চোখে আজও তার বহু প্রমাণ বর্ত্তমান। তিনি নীচে নেমেই সমীরণকে দেখে যেন একটু কুণ্ঠিত হয়ে উঠলেন; মৃদুস্বরে বললেন—ওমা! এ কে গো? একে তো আগে কখনও দেখিনি।

—আরে এর কথাইতো বলছিলাম! পথে দেখি বসে বসে কাঁদছে, কুড়িয়ে নিয়ে এলাম!

—কে আছে ওর?

—কেউ নেই বলেই তো মনে হচ্ছে। আগে ওকে কিছু খেতে দাও, কাল থেকে ও নাকি না খেয়ে আছে।

—আহা বাছারে! তুমি একটু বসো বাবা, আমি এখুনি তোমার খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—আর শোন! সেদিন মিণ্টুর জন্য মাষ্টারের কথা বলছিলে—

—সে আমি আগেই বুঝেছি, বেশ হবে। এই বলে তিনি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন।

—বেবী আর মীরা কোথায় ?

—তারা সিনেমায় গেছে। ওপর থেকে জবাব এলো।

—তুমি এখানে বস হে, আমি আর একটা কাজ সেরে আসি। ভদ্রলোক বাড়ী থেকে আবার বেরিয়ে গেলেন ! সমীরণ ধীরে ধীরে ঘরে গিয়ে বসলো।

একটু পরেই এক প্লেট ফল আর ডান হাতে জলের গ্লাস নিয়ে সেই মহিলাটি নীচে নেমে এলেন। তারপর সমীরণের সামনে টেবিলে খাবারগুলো নামিয়ে রেখে তিনি পাশের একটি চেয়ারে বসে বললেন—এখন এই খাও বাবা ! তারপর একটু পরে আমি খাবার তৈরী ক'রে দেব। খাও···আমার কাছে লজ্জা করোনা আমি তোমার মায়ের মত, খাও ! সমীরণ মাথা নীচু ক'রে খেতে আরম্ভ করলো। আম, লিচু, তরমুজ, এবং আরও দু একটা ফল, যা সমীরণ চেনে না।

আস্তে খাও সমীরণ, আস্তে খাও ! অত তাড়াতাড়ি ক'রে শেষকালে গলায় আট্‌কে মরো না। ভয় কি ? এবার থেকে এখানে তো তোমার স্থায়ী বসবাস সুরু হ'লো ! দুবেলা এক ঘণ্টা ক'রে মিণ্টুকে পড়াবে—আর বাড়ীর ছেলের মত এখানে থাকবে। আর তোমাকে পায় কে ?

আজ থেকে তোমার জীবনে এক নতুন অধ্যায় সুরু হ'লো। অত্যন্ত সন্তর্পণে, তোমাকে পথ চলতে হবে। প্রত্যেকটি পা তুমি ফেলবে বিচার ক'রে, বে-আন্দাজে যেখানেই পা দেবে—জেনে রেখো সেখানেই বিপদ। সমীরণ—সাবধান, খুব সাবধান !

ঘরে জ্বলছে উজ্জ্বল ইলেকট্রিকের আলো, মাথার উপর ঘুরছে ফ্যান্। পেটে পড়বে বাঁকতুলসীর ভাত আর কলের জল !

এ তোমার পাটনার কল নয়, এ হ'ল কোলকাতার কল! দুদিনে তুমি সভ্য হ'য়ে উঠবে সমীরণ! চুল হবে ব্যাক-ব্রাশ্‌ড্‌, চোখে উঠবে রিমলেস, পায়ে স্যাণ্ডেল আর গায়ে চওড়া পটির ঢিলে হাতা পাঞ্জাবী। এবার সকলেই তোমার সুন্দর রমণীয় চেহারার প্রশংসা করবে! বারে বারে নিজের রূপের স্তবগান শুনতে শুনতে বিরক্ত হ'য়ে উঠবে তুমি! হয়ত মুখের সিগারেটটাকে ছুঁড়ে ফেলে মিহিস্বুরে বলে উঠবে—ডোঞ্চিউ বি টকিং নন্‌সেন্স! সমীরণ তুমি সভ্য হবেই। সভ্য হওয়া তোমার অদৃষ্টলিপি, এর থেকে কেউ তোমায় রক্ষা করতে পারবে না···

অমন ক'রে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে আছ কেন? যে দুটি তরুণী মোটর থেকে নেমে এই বাড়ীতেই ঢুকলো, তাদের রূপ দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছো বুঝি? হতাশ হবার কোনই কারণ নেই, ওরা এক্ষুনি তোমার ঘরের পাশ দিয়ে ওপরে উঠে যাবে। ওরা এই বাড়ীরই মেয়ে। ওদের নাম বেবী আর মীরা। অসম্ভব রূপসী ওরা—না সমীরণ?

## [ তিন ]

এই ঘটনার পরে সমীরণের সম্বন্ধে আমি আপনাদের কাছে এক মাসের ঔৎসুক্যহীনতা প্রার্থনা করছি। এই এক মাস তার সম্বন্ধে আপনারা কিছুই শুনতে পাবেন না, কারণ শোনাবার মত কোন ঘটনা ঘটেনি। সমীরণের মত ছেলের জীবনে দু একদিন অন্তর একটি ক'রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটতে থাকবে, এ আশা আপনারা নিশ্চয় করেন না! তাই এই একমাস ধরে যা ঘটেছে, প্রত্যেকদিন তা দেখতে গেলে, সে দেখা আণুবীক্ষণিক। অতএব একমাস সময় বাদ দিয়ে আমি সুরু করছি, সেখান থেকে সমীরণকে আবার আপনারা লক্ষ্য করতে থাকুন।

আষাঢ় আরম্ভ হয়েছে। দুদিন থেকে বর্ষণের বিরাম নেই। ক্ষণে ক্ষণে দিক্-বিদিক অন্ধকার ক'রে নেমে আসছে বৃষ্টি, পথে জমছে জল, রিক্সাওয়ালার জমছে পয়সা। কোলকাতার বর্ষা, এর যেমন নেই কোন বিস্তার, তেমনি নেই এর কোন মোহ। ব্রাহ্মণ-বাড়ীর পূজোর ঘণ্টাধ্বনির মত, আকাশে অনবরতই ডাকছে মেঘ, আর ঝম্ ঝম্ ক'রে নামছে বৃষ্টি।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো। কাচের শার্শীর ভেতর দিয়ে চুপ ক'রে রাস্তার দিকে চেয়ে আমাদের সমীরণ বসে আছে তার একলা ঘরে। ছাত্র গেছে বৌবাজারে তার মাসীর বাড়ী বেড়াতে—মাকে সঙ্গে নিয়ে। বাড়ীর কর্ত্তা

এখনো অফিস থেকে ফেরেননি। বেবী আর মীরা বাড়ীতে আছে কিনা জানা নেই, কাজেই সে একলা—নিতান্ত একলা। না না, এখানে তার কোনই অসুবিধেই নেই। ঠিক সময়ে আসছে চা আর জলখাবার, ঠিক সময়ে ভাত, আর ঠিক সময়ে স্নানের তাগিদ! এ মাসে সে তার পকেট খরচের জন্য গৃহকর্ত্তার কাছ থেকে দশটা টাকাও পেয়েছে। সে বেশ আছে।··· তাতো তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি সমীরণ! কোলকাতার জলে তুমি আরও ফর্সা হয়েছ, তোমার মুখের রক্তিমাভা আরও স্পষ্টতর হয়েছে। আজ তুমি যে ভাবে ঈজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে বাইরের বৃষ্টি দেখছো,—সে রকম আধ-শোয়ার কায়দা আয়ত্ত করতে অনেকেরই বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। না, তুমি বেশ চট্ ক'রে উন্নতি করতে পারো। তোমার ভেতর এই সম্ভাবনা আমি লক্ষ্য করেছিলাম বলেইতো তোমাকে আমার উপন্যাসের নায়ক করতে পেরেছি। এর মধ্যে আর কি কি অভ্যেস করেছ বলতো। সিগারেট খেতে শিখেছ? শেখনি? স্যাড্!···এনি রোমান্স? নট ইয়েট!

—আলোটা না জ্বেলেই অন্ধকারে বসে রয়েছো—ব্যাপার কী?—বলতে বলতে বেবী ঘরে ঢুকে খট্ ক'রে আলোটা জ্বেলে দিতেই সমীরণ তড়াক ক'রে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—এমনি জ্বালিনি। বসুন!

—ব্যস্ত হয়োনা, বসছি। কিন্তু তুমি এখানে একলাটী বসে করছো কী?

—কিছুই না। এমনি বৃষ্টি দেখছিলাম।

—ও! তা—ভাবটাব কিছু এলো?

সমীরণ লজ্জিতমুখে চুপ ক'রে রইল। কারণ এই মেয়েটিকে সে মনে মনে ভয়ানক এড়িয়ে চলে। এর কথা এত ধারালো আর এত স্পষ্ট, যে জবাব দিতে না পেরে সমীরণ বিব্রত হয়ে পড়ে। অথচ কেন যে বেবী ওরকম করে কে জানে!

—কী? আমার সঙ্গে কথাও কইবে না নাকি? বেবীর স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো।

—না-না,-বলুন!

—বলছিলাম যে, তুমি এসময়টা এরকম বাজে নষ্ট না ক'রে অনায়াসে ওপরে আমার কাছে যেতে পারতে! তোমার মনে রাখা উচিত ছিল যে, আমিও ঠিক তোমারি মত একলা আছি!

—কেন? কুণ্ঠিতভাবে সমীরণ বললো!

দপ্ ক'রে বেবী জ্বলে উঠলো!—কেন? তোমার আপত্তি আছে কি কিছু? এ-রকম বাদলায় দু'জনে দুঘরে আলাদা না থেকে—একসঙ্গে একঘরে থেকে গল্প-গুজব করাটা কি মোর্ ডিজায়ারেব্‌ল্ নয়?

—গল্প—! সমীরণ বোকার মত ফট্ ক'রে বলে বসলো।

—হ্যাঁ গল্প! মীরার সঙ্গে কথা কইবার বেলায় তো দেখি তোমার রসনায় বাগ্দেবীর আবির্ভাব হয়—আর চাবিবন্ধ কি আমারই বেলায়? মীরাকে বুঝি তোমার বেশী পছন্দ?

—ও কথা কেন বলছেন? করুণস্বরে সমীরণ বললো!

—তবে কী কথা আর বলতে পারি বল? তুমি আমাদের বাড়ীর প্রাইভেট টিউটার। আমাদের দুটি বোনের মধ্যে একটিকে তুমি একটু বেশী পছন্দ করবে, আর একটিকে কম, এতো হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়, তাই;—বস সমীরণ, দাঁড়িয়ে

থেকোনা! ওখানে নয় এই চেয়ারটাতে! হ্যাঁ ঠিক হয়েছে! আচ্ছা এইবার বলতো আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি তোমাকে?… ওকি? তোমার মুখ অমন দেখাচ্ছে কেন? অমনি মন খারাপ হ'য়ে গেল? আচ্ছা-আচ্ছা আমি মাপ চাইছি।…এস খানিকটা কথা ক'ওয়া থাক্; কি কথা কই বলতো? বেবী তার বড় বড় চোখদুটি সমীরণের মুখের কাছে তুলে ধরলো!

সমীরণ? ইউ ফুল! এরকম স্বর্ণময় মূহূর্ত্ত তোমার জীবনে আর—দ্বিতীয়বার আসবে না! এই মূল্যবান সময়টুকুর অপব্যবহার তুমি করোনা সমীরণ! তোমার সাহচর্য্য লাভের জন্য বেবীকে তিনতলা থেকে নেমে আসতে হয়েছে, কেন ভুলে যাচ্ছ এ কথাটা? আস্তে আস্তে বেবীর চেয়ারের কাছে আর একটু সরে যাও, তারপর অতি সন্তর্পণে ওর হাতদুটি ধরো! তারপর কাণে কাণে বলার মত সুরে বল - বেবীদি! তুমি আজ এই আষাঢ় সন্ধ্যায় আমাকে যে কথা বলবার জন্য তোমার তেতলা থেকে নেমে এসেছো, তার গোপন অর্থ আমি বুঝেছি। মীরার সঙ্গে আমার কথা কওয়ার বাইরের চেহারাটা দেখে আমার ওপর অবিচার করোনা।…আজ এই মুহূর্ত্ত থেকে আমার বিশ্বস্ততা আমি তোমাকে নিবেদন করলাম।…বল সমীরণ বল। ষ্টুপিড্ ছেলে! বেবী যে অপেক্ষা করছে—তোমার কাছ থকে এই কথা ক'টা শোনবার জন্য! তা কি তুমি বুঝতে পারছো না? কী? পারবে না বলতে? তা আমি জানি। তোমার মত মেরুদণ্ড-ভাঙ্গা ছেলের দ্বারা কখনো হৃদয়-বিনিময়ের মত দু:সাহসিক কাজ হয়?

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর বেবী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আমি যাচ্ছি! খোকাপনা আমার ভাল লাগে

না! বেবীর কথার ভঙ্গী সমীরণকে চাবুকের মত আঘাত করলো। চমকে বেবীর দিকে চাইতেই সে একটু হেসে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, এবং যাবার সময় আলোটকে আবার নিবিয়ে দিয়ে গেল। সমীরণ আবার চুপ ক'রে জানালার দিকে চেয়ে বসে রইল। আর বাইরে ঘন বর্ষার মেঘ গুরু গুরু গর্জ্জন করে ফিরতে লাগলো...

বেবী কি চায় সে কথা অপ্রকাশই রইল, কিন্তু এই কথাটা থেকে থেকে সমীরণের বুকে খচ্ খচ্ ক'রে বিঁধতে লাগলো যে-বেবী তার প্রতি প্রসন্না নয়। বেবী জোর ক'রে, তিরস্কার ক'রে যে বস্তু তার কাছে আদায় ক'রে নিতে চায়, সে বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সমীরণের কোন চেতনা নেই। মীরাকে জিগ্যেস করলে হয়ত বা এর কোন কিছু একটা কিনারা হ'তে পারে। সমীরণ এই ভেবে মীরার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। আশ্চর্য্য? আজ কিন্তু মীরার দেখাই নাই মোটে! অন্যদিন রাত্রি সাড়ে ন'টার আগে মীরা এসে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা তার সঙ্গে গল্প ক'রে যায়! কিন্তু আজ তার পাত্তাই নেই। মীরা কি বাড়ীতে নেই নাকি?... অত ক'রে মীরার কথা ভেবো না সমীরণ! তাহ'লে বেবীর অভিযোগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার তোমার কোন উপায়ই থাকবে না। তোমাকে কেন্দ্র ক'রে যে দ্বন্দ্ব গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে এ বাড়ীতে, তাকে নির্ব্বিঘ্নে ঘটতে দাও—সে ঘটনার নায়কত্ব তুমি ইচ্ছে ক'রে তোমার কাঁধে নিও না।...হু হু ক'রে জলো হাওয়া শার্শীবন্ধ জানালায় বাধা পেয়ে ফিরে যাচ্ছে, তার গোঁ গোঁ শব্দটা খুব করুণ। এই বর্ষণমুখর রাত্রে মন স্বভাবতঃই সঙ্গ পেতে চায় কোন পরমাত্মীয় প্রিয়জনের, যে কোন কথা বলবে না, অহেতুক চাঞ্চল্য দ্বারা বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে না বাদল অন্ধকারের প্রশান্তি।

শুধু চুপ ক'রে কাছে বসে হাতে হাত রেখে, হাতের ভাষায়ে উচ্চারণ করবে মনের ভাষা। সমীরণ তুমি ঘুমিয়ে পড়ছো এখুনি মীরা তোমাকে খেতে ডাকতে আসছে, তার এ ঘরে আসা পর্য্যন্ত তুমি জেগে থাকবার চেষ্টা কর··· ।

অন্ধকার দ্বারপথে মীরাকে এবার দেখা গেল। ঘর অন্ধকার দেখে সে আপন মনেই বললো—একি! সমীদা! শুয়ে পড়েছ নাকি? তারপর আস্তে আস্তে ডাকলো – সমীদা! গানের মত চাপা সুরে ওই শব্দটি ওর কণ্ঠ থেকে বেরুলো। উত্তর না পেয়ে মীরা টেবিলের পাশ দিয়ে সমীরণের চৌকির দিকে এগিয়ে চললো। দেখতে পেল সমীরণ একটা ইজিচেয়ারে চুপ ক'রে পড়ে আছে। মীরা তার পাশের চেয়ারটিতে নিঃশব্দে বসে অতি মৃদু ভাবে ওর কপালের ওপর নিজের হাতখানা রাখলো!···সমীদা!··· খাবে না সমীদা?···এইবার সমীরণ যেন তন্দ্রা থেকে জেগে উঠলো।···কে মীরা? ··হ্যাঁ আমি। তুমি খাবে এস!

···তোমার সঙ্গে আমার দু একটা কথা আছে মীরা!—আমার সঙ্গে? বল!···মীরার হাতখানি সমীরণের কপাল থেকে নেমে ওর হাতের মধ্যে আত্মসমর্পণ করলো। সমীরণ আস্তে আস্তে নিজের ডান হাত দিয়ে ওর বাঁ হাতের অনামিকার মিনে করা আংটিটাকে ঘোরাতে লাগলো। ঝম্ ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে, ঘরের অন্ধকার ক্ষণে ক্ষণে উঠছে বিদ্যুচ্চকিত হ'য়ে। অবরুদ্ধ আবেগে সমীরণের ঠোঁটদুটি থর থর করে ক'রে কাঁপতে লাগলো।

বল-সমীরণ-বল! মীরা—বেশী নয়, মীরা-মীরাই। সান্ত্বনা-ময়ী মৃদুভাষিনী মীরা। আজ এই বর্ষার রহস্যঘন পরিস্থিতিতে

বল সমীরণ! অনুভব করো তোমার হাতের মধ্যে মীরার হাতখানি ধীরে ধীরে ঘেমে উঠছে; ওর এই ভীরু মোহটুকু থাকতে থাকতে তুমি ওকে যা-হোক কিছু বল!…জীবনে অনেক কিছুই হয়ত তুমি পাবে, অনেক খ্যাতি, অনেক মালা, অনেক অর্থ—কিন্তু ঠিক এমন ভাবে মীরার হাতখানি তুমি আর আয়ত্তের মধ্যে পাবে না! বল-সমীরণ-বল!

কয়েক মিনিটব্যাপী একটি রমণীয় স্তব্ধতা। সুগভীর, তলহীন, নিস্তরঙ্গ একটি স্তব্ধতা। সমীরণ অনুভব ক'রতে লাগলো তার হাতের মধ্যে মীরার হাতখানি একেবারে স্তব্ধ হয়ে আত্ম-সমর্পণ করেছে! মীরা,—সুন্দরী মীরা—যার আগমন প্রতীক্ষায় সমীরণ তার একলা ঘরে মনে মনে উঠেছিল চঞ্চল হ'য়ে - সেই মীরা স্থির ভাবে বন্দী হয়ে আছে তার মুঠোর মধ্যে। এর জন্য রীতিমত একটা পৌরুষের গর্ব্ব অনুভব করা উচিত সমীরণের। অনেকক্ষণ পরে মীরা ব'ললো—খেতে যাবে না সমীদা?

—যাই। সমীরণ তার নিষ্কম্প অবস্থানের মধ্যে থেকেই জবাব দিলো।

—আমাকে কি বলবে বলছিলে? মীরা ধীরস্বরে প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ। বলছিলাম কি…আচ্ছা মীরা,—বেবীদি' কেন আমাকে অযথা কড়া কথা বলে,—কিন্তু তুমি তো আমাকে—

একি সমীরণ! এত শীগগির? এত শীগগির মীরাকে তুমি এই কথা বলবে? তাও আবার অমনি ক'রে নভেলি ছাঁদে? নাঃ, আর কোন আশা নেই! সভ্যতা তোমার রক্তে দোলা দিয়েছে দেখছি!

মীরা বলতে লাগলো,—বেবীদির কথা জানি না, তবে তোমাকে আমার ভাল লাগে। তুমি বেশ সহজ মানুষ, আর তার ওপর—মীরা চট্‌ করে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আমি চল্লাম সমীদা, মিণ্টুকে নিয়ে মা এসে পড়েছেন—তুমি খাবে এস!

—শোন মীরা! আমার কথা যে শেষ হয় নি এখনো—! সমীরণ মীরার হাত চেপে ধরলো।

—আঃ! ছেলে-মানুষী করোনা সমীদা! মা আসছেন! ত্রস্ত পদে ঘর থেকে মীরা বেরিয়ে গেল, আর সমীরণ হতভম্বের মত আবার বৃষ্টিমুখর রাস্তাটার দিকে চেয়ে রইল···

সমীরণ! সিচুয়েশন-মাফিক নিজেকে তৈরী করবার চেষ্টা কর! তোমার ঘরে এত বড় রোম্যাণ্টিক ঘটনা ঘটে গেল, আর তুমি আহাম্মকের মত বসে রইলে! চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত দুটো পেছনে রেখে ঘরময় অন্ততঃ বার দুয়েক পায়চারী কর,—মাঝে মাঝে মাথার বড় বড় চুলগুলোকে টেনে পেছনের দিকে ঠেলে দাও! তবে তো! তা নয়, ক্যাবলার মত চেয়ারে বসে থাকলে লোকে ভাববে মীরার প্রতি তোমার প্রেম বুঝি তেমন ঐকান্তিক নয়। স্মরণ কর, শরৎ চাটুজ্যের 'চরিত্রহীনে' সাবিত্রী যখন সতীশের হাত থেকে আঁচল ছাড়িয়ে 'ছি—আসছি' বলে চলে গেল, তখন সতীশের মনে কি বিপ্লব বেধেছিল, তুমি সেই রকম কর! ওই সব অমর উপন্যাসের সুবিখ্যাত সিচুয়েশন-গুলি স্মরণ কর, আর নিজেকে তৈরী করবার চেষ্টা কর! তোমাকে নিয়ে আমার হয়েছে মুস্কিল, এই বিরাট সহরে এখনও তুমি এত বেশী পরিমাণে বেমানান যে তোমার জন্য আমি

মাঝে মাঝে বেশ ভীত হয়ে উঠি। তুমি করবে কী বলোত? মেয়েরা ব্যথা দিয়ে গেলে তুমি কায়দা-মাফিক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে পারো না,—কস্‌মেটিক্‌, লিপষ্টিক, হেয়ার লোশন, সুর্মা, কত রকম আছে তা জানো না, ৩৮-মডেল গাড়ীগুলোর নাম মুখস্থ করে রাখোনি, এলিস্‌-ফ্রয়েড-ষ্টোপস্‌-নরম্যান তোমার পড়া নেই, তুমি করবে কি সমীরণ?

বেবী-মীরার মা ঘরে ঢুকে বললেন—তোমার কি শরীর ভাল নেই সমীরণ? সমীরণ চট ক'রে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললো—না, আমিতো ভালই আছি মা!—তবে খেতে যাওনি কেন বাবা? রাত্রি দশটা বেজে গেছে—এবার খেতে যাও! —যাই, বলে সমীরণ দরজার দিকে এগোল।

রাত্রে ভাল ঘুম হ'ল না। তার পরের দিনও সারাটা দিন ধরে সমীরণ কি যেন একটা ভাবতে লাগলো। কী একটা অনাস্বাদিত মধুর স্পর্শ পেয়েছে, তাই থেকে থেকে আজ কেবলই ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। সকালে মিণ্টুকে ভাল ক'রে পড়ানো হ'ল না, দুপুর বেলায় খেতে বসে সমস্ত তরিতরকারী ঠেকলো বিস্বাদ। বিকেল বেলায় ঘুম থেকে উঠে সমীরণ ভাবলো একটু বেড়িয়ে আসা যাক্—তাহ'লেই মনটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু মজা এই যে সমীরণকে জিগ্যেস করলেও বলতে পারবে না, এই মন খারাপের কারণটা কি! মনটা খারাপ হয়েছে—অতএব বেড়াতে যেতে হবে। নিজেকে বিশ্লেষণ করবার শক্তি এখনও ওর হয়নি। আর ঠিক এই জন্যই সমীরণ এত ছেলেমানুষ হয়ে পড়ছে দিন দিন!

দরজা দিয়ে বেরোবার মুখে দোতলায় দণ্ডায়মানা মীরার সঙ্গে

সমীরণের মুখোমুখি দেখা। মীরা বললো—সমীদা! বেড়াতে যাচ্ছো বুঝি? কাইণ্ডলি একটু দাঁড়াওনা, আমিও যাব! সমীরণ দাঁড়াল,—একটু পরেই মীরা নীচে নেমে এসে একসঙ্গে রসা রোডের দিকে চলতে আরম্ভ করলো।

আষাঢ় মাস হ'লেও আজকের আকাশ অত্যন্ত পরিষ্কার। শেষ-সূর্য্যের আরক্ত চুম্বনে সমস্ত দিগন্ত রক্তিম। দলে দলে লোকজন চলেছে বেড়াতে। যেতে যেতে মীরা এক সময় বলে উঠলো—মাথাটা এমন ধরেছে কাল রাত্তির থেকে! সমীরণ যেন নিজের মনেই একটুখানি চমকে উঠলো। তারও তো তাই! তবে কি কারণটা একই? সমীরণ বললো—আমারও তাই।

—ওমা—তোমারও তাই? মীরা ফিক্ ক'রে হেসে উঠলো। —আচ্ছা কাল আমি আসবার আগে দিদি বুঝি এসেছিল তোমার কাছে?—

—হ্যাঁ।

—কিছু বলছিল?

হ্যাঁ। বেবীদি' মিছিমিছি আমাকে খানিকটা বকে গেলেন —এই বৃষ্টির দিনে আমি তাঁর ঘরে গিয়ে গল্প-গুজব করিনি কেন! আচ্ছা বলতো মীরা, মাত্র এইটুকু অভিযোগ নিয়ে কি একটা মানুষকে তিরস্কার করা চলে? তা ছাড়া আমি যখন বেবীদির কাছে কিছুই অপরাধ করিনি! কই তুমিতো আমাকে কিছুই বল না! বেবীদির কথাবার্ত্তা আমার ভাল লাগে না।···সমীরণ! থাম! তুমি যে মূর্খ, তার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছ! এইবার থাম!

—হুঁ। চলতে চলতে খুব গম্ভীরভাবে মীরা বললো। —আমি জানি দিদি কী চায়? লাষ্ট ইয়ারে অরুণদা [illegible] ইসাইডের

ব্যাপারটার পর থেকেই দিদিকে আমি চিনি। তুমি ওর মধ্যে যেওনা সমীদা!

—অরুণদা কে?

—সে ছিল দিদির ক্লাশ ফ্রেণ্ড। আমাদের বাড়ীতে আসা যাওয়া ছিল তার। দিদিকে খুব ভালবাসতো। চল এই সরবতের দোকানটায় দুটো আইস্‌ক্রীম খেয়ে নি। চমৎকার করে এরা, খেয়েছ কোনদিন?

—নাতো!

—তবে খাবে এস!

উভয়ে গিয়ে সরবতের দোকানে ঢুকলো। দোকানদারের শিষ্টাচার মুহূর্ত্ত মধ্যে গভীর ব্যস্ততায় রূপান্তরিত হ'ল।...আসুন, আসুন...ওরে গদা, এইখানে দুখানা চেয়ার দে...হ্যাঁ এই বারান্দায় বসুন...না, ঘরের ভেতর বড্ড গরম, পাখার হাওয়ায় কি আর গরম যায়...তারপর.. কি দেব আপনাদের?

—দুটো আইসক্রীম। মীরা বললো।

—ছোট না...বড়?

—যা ইচ্ছে।

—আচ্ছা।...আর কিছু?

—না। থ্যাঙ্কস্! মীরা রাস্তার দিকে চেয়ে উচ্চারণ করলো। দোকানদার চলে গেল।

—সমীরণ! ইংরেজী ভাষার এই 'থ্যাঙ্কস্' শব্দটা তুমি শিখে নাও দেখি! আধুনিকতার ওটা একেবারে প্রথম কথা। এই শব্দটির যথাযথ প্রয়োগ তোমাকে মানুষ ক'রে তুলবে। পিতা জিজ্ঞেস করবেন—কেমন আছ বাবা? তুমি চটপট জবাব

দেবে—ভালই, থ্যাঙ্কস্! মা জিগ্যেস করবেন—তোকে কি আর একটু মোচার ঘণ্ট দেবো সমী? তুমি উত্তর দেবে—না, থ্যাঙ্কস্! প্রিয়া বলবে—তোমাকে কি আর একটু চা দেবো গো? তুমি বলবে—হ্যাঁ, থ্যাঙ্কস্! অতি আধুনিকতার প্রধান দায়ীত্বই হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীকে থ্যাঙ্কস্ দেবার থ্যাঙ্কলেস্ দায়ীত্ব। ওটা শেখো—বুঝলে?

সমীরণ আর মীরা ওইভাবে প্রকাশ্য বারান্দায় বসে আইস-ক্রীমে চুমুক দিচ্ছে সহরের লোকদের পক্ষে এটা একটা দেখবার বস্তু। এই ধরণের দৃশ্য খুব চিত্তোত্তেজক বলে নাগরিকরা এটা অত্যন্ত পছন্দ করে। এই পছন্দ করার মধ্যে যদিও লুকিয়ে থাকে তাদের নিজেদের লোলুপতা, তবুও তারা এটা পছন্দ করে। তাই চারপাশ থেকে অনেকগুলি চোখ রীতিমত বুভুক্ষু দৃষ্টিতে ওদের লক্ষ্য করছিল। সমীরণ সুন্দর, আর মীরাও রূপবতী। তারা এমনভাবে এদের দিকে চেয়েছিল যেন আগ্রার ফোর্ট দেখছে..!

—লোকগুলো এমন ক'রে চেয়ে কি দেখছে বলতো সমীদা? মীরা বিরক্ত হয়ে বললো।

—বোধ হয় তোমাকে। সমীরণ হেসে জবাব দিলো।

—আ-মাকে! নিশ্চয়ই না, ওরা দেখছে তোমাকে।

—আমাকে! আমার মধ্যে দেখবার কি আছে?

—আছে বইকি। মীরা মুচকে একটু হাসলো।—এই দেখ! অমনি লজ্জা? তোমার লজ্জা পাবার মত কোন কথাতো আমি বলিনি সমীদা! কি আশ্চর্য্য! তোমার গ্লাস ধরার ভঙ্গীটাও ভারী চমৎকার তো!

সমীরণ। আইসক্রীমের গ্লাসশুদ্ধ তোমার হাত হঠাৎ কাঁপছে।

কেন? ও, দেখেছি, রাস্তা দিয়ে একটি মড়া নিয়ে যাচ্ছে। চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছেলেটি মারা গেছে—তার তরুণী স্ত্রীকে দুজন লোক ধরে নিয়ে চলেছে স্বামীর মুখাগ্নির জন্য। এই সামান্য ব্যাপারে তোমার হাত কাঁপে সমীরণ? মৃত্যু তোমাকে এত বিচলিত করে? ওদিকে মন দিয়ো না, তোমার হাতের গেলাসে এখনও যে অবশিষ্ট রঙ্গীন পানীয়টুকু আছে, সেটুকু নিঃশেষে পান ক'রে নাও! কোন দ্বিধা না ক'রে, বিবেচনা না ক'রে তৃপ্তির সঙ্গে চুমুক দাও; তার পরে শূন্যপাত্রটি ঠক্ ক'রে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ওর যথাযোগ্য মূল্য দিয়ে—দোকান থেকে বেরোও এবং মাথা সোজা ক'রে রাস্তা দিয়ে চলতে থাক! স্মার্ট হতে শেখো সমীরণ, স্মার্ট হতে শেখো—বুঝলে?

দুজনে পার্কের নিভৃত বেঞ্চিটার উপর গিয়ে চুপচাপ কেবল বসেই রইলো। দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে অন্ধকারে আলোর শ্রেণী, কালো মেয়ের গলায় সোণার কণ্ঠহারের মতো। দলে দলে লোক চলেছে সম্মুখ দিয়ে, কেউ গুন্ গুন্ ক'রে গান গেয়ে; কেউ আপন মনে বিড় বিড় ক'রে বকতে বকতে, আবার কেউ কেউ বা নিঃশব্দে। উত্তরের বেঞ্চিটায় বসে আছে তাদেরই মত একটি ছেলে আর একটি মেয়ে, কথা তারাও কইছে না। এমনিই হয়, কথা এমনি ক'রেই হারিয়ে যায়। যেখানে সুন্দর, সুসজ্জিত, আবেগময় কথার একান্ত প্রয়োজন, সেখানে একটু চাওয়া, একটু কেঁপে ওঠা একটু হাতে হাত রাখা,—এর বেশী আর কিছুই এগোয় না।

সমীরণ বসে আছে বুদ্ধমূর্ত্তির মত। মানুষের বসবার ভঙ্গীতে যে একটা কল্[illegible], 'একটা সৌকুমার্য্য আছে, একথা আজ

যেন সে ভুলে গেছে। অত্যন্ত আড়ষ্ট হ'য়ে, দেহটাকে অনাবশ্যক রকম সোজা ক'রে, সামনের দিকে চেয়ে সমীরণ বসে আছে। আর ঠিক তার পাশটিতে মীরা বসেছে তার তনু-দেহকে অত্যন্ত লীলায়িত ক'রে; সে ভঙ্গী—অপেক্ষার ভঙ্গী, প্রত্যাশার ভঙ্গী। কিন্তু আমাদের সমীরণ তো কথা কইবে না—কিছুতেই কইবে না! কথা না কইতে পারার দুর্ভেদ্য মূঢ়তা রয়েছে ওর মজ্জায়; আজ এই মুহূর্ত্তে সেই দোষের অপসারণ অসম্ভব। মীরা কিন্তু কিছু বলবে,—নিশ্চয় বলবে! বেশ বুঝতে পারছি যে কথা ওর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হবে—অন্তরের অন্তঃপুরে তার রচনাকার্য্য চলেছে। আজ এই মধুর অবসরকে মীরা বিফলে বয়ে যেতে দেবে না। তাকে ফলবান ক'রে তুলতে যে কোন রকম প্রগলভতাকে ও স্বীকার করে নেবে, এরকম একটা প্রতিশ্রুতি মীরার চোখের দৃষ্টিতে পাওয়া যাচ্ছে।

—সমীদা! মীরা মিষ্টি ক'রে ডাকলো। সমীরণ মীরার দিকে চাইলো। মীরা নার্ভাস হয়ে ঢোক গিলে বললো—তোমরা বৈদ্য, না সমীদা?

—হ্যাঁ। কেন? সমীরণ উত্তর দিলো।

—না, এমনি বলছিলাম, আমরা কায়েত কিনা, তাই বলছিলাম।

মীরা! সমীরণ ডাকলো।

বল সমীদা! মীরা তার বড় বড় দুটো চোখ সমীরণের মুখের উপর রাখলো।

—তোমাদের ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না।

এই কথা! এত বড় প্রত্যাশার এই [illegible]প্তি! হায় সমীরণ!

এর চেয়ে তুমি যদি বলতে—মীরা! আজ দুপুরে কুমড়ো চচ্চড়িটা রান্না করেছিল কে, সেও যে এর থেকে ভাল শুনতে হোত! চেয়ে দেখ মীরার মুখখানা অকস্মাৎ অন্ধকার হ'য়ে উঠেছে।

—ঋণশোধের কথা আমাকে শুনিয়েতো কোন লাভ নেই সমীদা, সেকথা বরং বাবাকে বলো!

- না মীরা, তুমি বুঝতে পারছো না,—বৈদান্তিকের মত উদাস দৃষ্টি আকাশে স্থাপিত ক'রে সমীরণ বলতে আরম্ভ করলো; - আমি মাঝে মাঝে যখন তোমার বাবার কথা ভাবি, তখন অবাক হই এই ভেবে যে, আমার মত অযোগ্য, আমার মত অক্ষম একটা ছেলে কি ক'রে তাঁর নজরে পড়লো! তাঁর প্রশান্ত দৃষ্টি—

—বাড়ী চল সমীদা, রাত্রি হয়ে গেছে। মীরা উঠে দাঁড়িয়েছে।

—হ্যাঁ চল। দ্বিরুক্তি না ক'রে সমীরণও উঠে দাঁড়াল এবং মীরার পাশে পাশে চলতে আরম্ভ করলো।—আর তোমার মা; মীরা! এমন মা আমি—

—তাড়াতাড়ি হাঁটো সমীদা, আমার আবার একটা এনগেজ-মেণ্ট আছে!

—ও! সমীরণ তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো।—না, না আমি ঠাট্টা করছি না মীরা, তোমার মায়ের মত মা জগতে খুব অল্প লোকেই—

পায়! জানি সমীরণ! কিন্তু ধিক তোমাকে! তুমি কিনা বাবার স্তবগান সুরু করলে শেষকালে ওর কাছে? তুমি নিবেদন করলে কেবল কৃতজ্ঞতা, আর কিছুই না? ছি ছি সমীরণ, তোমার অকৃতকার্য্যতায় লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। ধিক্ তোমাকে, সমীরণ! ধিক্ তোমাকে!

সেদিন রাত্রে মীরার বদলে বেবী এলো সমীরণকে খেতে ডাকতে। লিক্‌লিকে চেহারার বেবী ; ধারালো তলোয়ারের মত যে রূপে আর প্রসাধনে সর্ব্বদাই চকচক্ করছে। ওকে দেখলেই মনে হবে যে কোন মুহূর্ত্তে হাসতে হাসতে ও তোমাকে কেটে দুখানা ক'রে ফেলবে। তুমি টেরও পাবে না যে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছ।

সমীরণ তখন বসে বসে রবীন্দ্রনাথের দুই বোন পড়ছিল। বেবী কখন যে এসে তার পেছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে সে টেরও পায়নি। দুই বোনের জটিল মনস্তত্ত্বের গহনতম অরণ্যে সমীরণ তখন পথ হারাবার উপক্রম করেছে।

—সান্ধ্যভ্রমণে কতদূর যাওয়া হয়েছিল? সমীরণ চমকে বই থেকে মুখ তুলে দেখলো বেবী ইতিমধ্যেই তার পেছনে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বেবীকে দেখেই সে কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠলো। বেবীর চোখের দৃষ্টি এত সন্ধানী আর তার মুখের কথা এত স্পষ্ট যে সমীরণ কুণ্ঠিত না হ'য়ে পারে না।

—বেশী দূর নয়—সমীরণ বলতে চেষ্টা করলো।

—ও! কাছেই?—কোথায়?

—পার্কে—

—হুঁ। কি কথা হ'ল মীরার সঙ্গে?—বেবীর চোখে মুখে বিদ্রূপ।

—কথা কিছু হয়নি।

—অবশ্য হয়েছে। আচ্ছা আমাকে দেখে কি তোমার এতই বোকা বলে মনে হয় সমীরণ, যে এই সামান্য ব্যাপারটাও আমার কাছে গোপন করবার চেষ্টা করছো? কথা কিছু তোমাদের নিশ্চয় হয়েছিল—

—না হয়নি বেবী দি !

—হয়েছে বেবীদি ! নইলে পার্কে গিয়ে তোমরা করলে কী ?

—বসেছিলাম।

—চুপচাপ ? দুজনে মুখোমুখি গম্ভীর দুঃখে দুখী ? কিন্তু সে যে আরো ভয়ানক কথা সমীরণ !·· আমায় নিয়ে কাল বেড়াতে যাবে ? সমীরণ চুপ ক'রে রইল।—তোমার সঙ্গে বেড়াবার আমার বড্ড ইচ্ছে। সেই ইচ্ছেয় আমি মরে যাচ্ছি মনে মনে। চল না সমীরণ, কাল আমরা কোথাও বেড়াতে যাই। সঙ্গী হিসেবে মীরার চাইতে আমি বোধ হয় খারাপ নয়, কেমন ?

—না—না—

—শুধু না না বললে হবে না সমীরণ, কাল তোমাকে যেতেই হবে। তাহ'লে এই কথা রইল, কেমন ? ও ! তুমি খাবে এস সমীরণ ! মনে পড়লো আমি তোমাকে খেতে ডাকতে এসে-ছিলাম। তোমার কাছে এলে আমি সব ভুলে যাই। চল সমীরণ খেতে চল !···সমীরণ তখনও বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে বেবীর মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে, বেবী তার হাত ধরে ঈষৎ টান দিয়ে বললো—চল লক্ষীটি ! তারপর সমীরণের কাণের সঙ্গে নিজের মুখটা ঠেকিয়ে বললো—কাল থেকে তুমি আমাকে দিদি বলা ছাড়বে—এই আমি তোমাকে বলে রাখলাম !

সমীরণ শিউরে উঠেছে—ভীষণ শিউরে উঠেছে। কারণ বেবীর সুগন্ধিত চূর্ণকুন্তল সমীরণের গণ্ড স্পর্শ করেছে। কী মধুর গন্ধ বেবীদির চুলে—স্বপ্নময়, আবেশময়, রহস্যমদির। চল সমীরণ চল ! ঝাউ [illegible] মোলায়েম আর গোপন বেবীদির সেই

ডাক। কোথায় যেন কোল পেতে বসে আছে একটা হিমশীতল মৃত্যু, বেবীদির দৃষ্টির মধ্যে তারই নিঃশব্দ হাতছানি···

কোন রকমে খাওয়া শেষ ক'রে সমীরণ টলতে টলতে ঘরে ঢুকে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। মাথার কাছের জানালা দিয়ে জ্যোস্না এসে পড়েছে তার বালিশে। চোখ চাইলেই দেখা যাবে—আষাঢ় গগনে ভাঙা ভাঙা মেঘের মাঝখান দিয়ে চাঁদ চলেছে। চাঁদ চলেছে ; শরতের সুনীল বিস্তৃতির স্বপ্ন তার চোখে, তাই ওই সঙ্গিবিহীন আড়ষ্ট চাঁদ—দু হাতে ঠেলে চলেছে বর্ষা আকাশের মেঘাচ্ছন্ন পুঞ্জীভূত বর্ত্তমানকে। আজ এই গভীর রাত্রের মরা জ্যোৎস্নার আলোয় নিংশ্বসিত হচ্ছে যেন বহু লোকের না পাওয়া আর পেয়ে হারানোর দীর্ঘনিঃশ্বাস···

চল—সমীরণ···চল! সমীরণের দুই কাণ ভরে বাজতে লাগলো সেই দক্ষিণ-সমীরণ-লাগা ঝাউ মর্ম্মরের ফিস্‌ফিস্ ডাক। জলের উপরকার সূক্ষ্ম তরঙ্গাবর্ত্ত রেখার মত সমীরণ একটা মৃদু শিহরণ অনুভব করছে দেহে ও মনে ; শরীরের কোন অঙ্গ দিয়ে কী যেন একটা গা বেয়ে উঠছে, তারই একটা অস্পষ্ট শির-শির করা অনুভূতি .! চল সমীরণ চল !···কোথায় যাবে সমীরণ? কোন্ নিষ্ঠুরতম পরিণাম তার জন্য অপেক্ষা করছে? চল সমীরণ চল !···কী মৃদু সুগন্ধ বেবীদির চুলে,—কী ইঙ্গিতমুখর বেবীদির আঙুলের ডগার ছোঁয়া, কী মিনতিময় আহ্বান বেবীদির চোখে !

নাঃ। এ ছেলেটা দেখছি পাগল হয়ে যাবে! ঘুমাও সমীরণ ঘুমাও! বেবী, তুমি ওকে ছেড়ে দাও, তুমি অত্যন্ত অযোগ্যকে ভালবেসেছ। এই যৌবন-ভীতু ছেলেটাকে নিয়ে তুমি করবে কী?

ছেড়ে দাও বেবী—ছেড়ে দাও! চেয়ে দেখ বেবী, তোমার সামান্য একটু কৌশল ওকে নিদ্রাহীন করে তুলেছে, বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্ করছে। সারা সহর ভ'রে অসংখ্য ছড়ান রয়েছে তোমার রূপ-পূজারীর দল। এ কে না হ'লেও তোমার চলবে। তোমার শর-সন্ধানের এ যোগ্যই নয়, ছেড়ে দাও এ বেচারাকে! নইলে ও মরেই যাবে।

## [ চার ]

বিছানায় পড়ে অনেকক্ষণ ছট্ফট্ করার পর সমীরণ ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও বেশ বোঝা গেল বেবীর স্পর্শের প্রভাব সে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। পারবেও না। আমি জানি ও পারবে না! কারণ ওর জীবনে এটা প্রথম। এই ভাল-লাগা আর শিউরে ওঠা বহুকাল পর্য্যন্ত ওর মনে থাকবে। সারারাত্রি ধ'রে এই অনুভূতি নানা স্বপ্নের রূপ নিয়ে সমীরণের চোখের তলে যাওয়া আসা করবে। তার কত না রূপ, কত না রং আর কত না মোহ। এই সুন্দর ছেলেটিকে নষ্ট করে দেবার জন্য যেন অন্ধকার রাত্রি ভরে একটা ষড়যন্ত্র চলেছে। সামান্য একটু মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে সমীরণের মুখের রেখায়, আর নাকের ডগায় কয়েকটি ঘামের বিন্দু।

এই অবস্থায় সমীরণকে আপনারা দেখেন নি, দেখলে সেখান থেকে আর চ'লে আসতে পারতেন না। আশ্চর্য্য হ'য়ে চেয়ে থাকতে হ'তো ওর অভাবিত রূপৈশ্বর্য্যের দিকে। অদ্ভুত দেখতে হয় ও ঘুমুলে। সমস্ত শরীরটা দেয় এলিয়ে। একটা শিথিল সৌন্দর্য্যের প্রতীক যেন। একটা মন-কেমন-করা সৌন্দর্য্য ওর! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে ওর এই নিদ্রার রূপটি বেবীর চোখে পড়েনি!

পরদিন বিকেল—

বেবীর মা এসে বল্লেন—সমী, বেবীকে তুমি একটু বেড়িয়ে আনতে পারো? ভয়ানক নাকি মাথা ধরেছে ওর! খোলা হাওয়ায় বেড়ালে এক্ষুনি ছেড়ে যাবে। আমার উপায় নেই।

মিণ্টু আর মীরাকে নিয়ে আমাকে যেতে হ'বে বাপের বাড়ী। ছোট কাকার বড্ড বাড়াবাড়ি অসুখ যাচ্ছে।...সমীরণ তখনও তাঁর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে দেখে তিনি বল্লেন ভয় নেই, তোমাকে হেঁটে যেতে হবেনা বাবা। ওর বন্ধু দীপ্তি গেছে দার্জ্জিলিংয়ে, যাবার সময় তার গাড়ীখানা রেখে গেছে বেবীর জিম্মায়। বলে গেছে মধ্যে মধ্যে চালাতে। যাই হোক বেবীকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এস। অমন ক'রে চেয়ে আছ যে! তোমার শরীর ভাল আছে ত?

—হ্যাঁ মা।

—তাই ভাল। আমি মনে করলাম - যা দিনকাল পড়েছে!

—যাচ্ছো তাহ'লে?—

—হ্যাঁ!

—যাই আমি বলিগে বেবীকে। মেয়ের আবার এদিক নেই ওদিক আছে। বল্লাম—বেড়াতে যাবি, তা বল্‌গে না সমীকে! তা বলে,—আমার কথা যদি না রাখে? তুমিই বলগে।

সমীরণ মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি অনুভব করছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল-কাজটা ভাল হবে না। কিন্তু বেবীর মায়ের আদেশ সে অমান্য করতে কিছুতেই পারেনা। তার নিজের মায়ের সেবা যত্নের সঙ্গে বেবীর মায়ের সেবা যত্নের কোনই প্রভেদ নেই। তিনি বেবী আর মীরাকে যেমন দেখেন, মিণ্টুকে যেমন দেখেন, সমীরণকেও ঠিক তেমনি দেখেন। সমীরণের পক্ষে অত্যন্ত অমানুষের কাজ হবে তাঁর কথা না শোনা। না, সে যাবে, নিশ্চয় যাবে; বেবীর মাথা ধরে থাকুক আর নাই থাকুক, সে যাবেই।

একটু পরে বাড়ীর দরজায় গাড়ী এসে দাঁড়াল। সমীরণ চা আর জলখাবার খেয়ে, গাড়ীর কাছে এসে দেখলো বেবী ইতি-মধ্যেই গাড়ীর মধ্যে এসে বসে আছে। সমীরণকে ইতঃস্তত করতে দেখে সে বল্‌ল, এস। সমীরণ কুন্ঠিত ভাবে গিয়ে বেবীর পাশে ধপ্‌ ক'রে বসে পড়লো। ড্রাইভার গাড়ী চালিয়ে দিল।

চল্লে সমীরণ? ব্যাপারটা একটুও ভেবে বা তাকিয়ে দেখবার প্রয়োজন বোধ করলে না? বেবীর মাথা ধরেছে তা তোমার কি? তুমি তো অনায়াসে বলতে পারতে যে তোমার একটা বিশেষ জরুরী দরকার আছে, কিম্বা তোমার পেটের অসুখ করেছে! অনায়াসেই বলতে পারতে! তা'হ'লে তোমাকে এই দায়ীত্ব-সঙ্কুল পথ-যাত্রায় পা বাড়াতে হতোনা। চক্ষুলজ্জাটা তোমার ছাড়ো দেখি! এই চক্ষুলজ্জাটাই তোমাকে শেষ করবে। ভেবে দেখো সমীরণ, যদিও আজ আকাশ পরিষ্কার—জলহীন খণ্ড খণ্ড মেঘ যদিও নির্ব্বিকার বৈরাগ্যে আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত অকারণ পায়চারী করছে, তবুও ওরা আষাঢ়ের মেঘ, ওদের খুব বিশ্বাস করোনা। যে কোন মূহুর্ত্তে ঘনতম ধারা-বর্ষণে ওরা বিগলিত হ'তে পারে! তা যদি হয় তারপর কি হবে সমীরণ? আমার যেন মনে হচ্ছে তুমি না গেলেই ভাল করতে!

বড় রাস্তায় পড়তেই বেবী ড্রাইভারকে বললো—গ্যালন চারেক পেট্রোল নিয়ে নাও; ডায়মণ্ড হারবার যেতে হবে। ডায়মণ্ড হারবার! সমীরণের সমস্ত শরীর ভয়ে অবশ হ'য়ে এল। সে কি! সে যে অনেক দূর! সন্ধ্যে হয়ে আসছে—এখন কি ডায়মণ্ড হারবার যাবার সময়? সমীরণ একবার বেবীর দিকে চাইলো। ইচ্ছে, প্রতিবাদ স্বরূপ কিছু একটা বলবে। গাড়ী পেট্রোল ষ্টেশনে

ঢুকে তেল নিতে লাগলো বেবী তার স্যাচেল থেকে একখানা নোট ব্যার ক'রে ড্রাইভারের হাতে দিলো।·· একটু পরে গাড়ীটা আবার চলতে আরম্ভ করলো।

সমীরণ এখনও সময় আছে। এখনও তুমি ইচ্ছে করলে বেবীর ডায়মণ্ড হারবার অভিযান বন্ধ করতে পারো! এখনও তুমি বেবীকে অনায়াসেই অন্য রাস্তায় নিয়ে যেতে পারো! কিন্তু মাইলের পর মাইল নির্জ্জন প্রান্তর-পথ বেয়ে বেবীর সঙ্গে তুমি যেয়োনা সমীরণ! মুস্কিলে পড়বে। তবু আড়ষ্ট হ'য়ে বসে রইলে?···

দুধারে মাঠ আর বন। মাঝখান্ দিয়ে উন্মাদ গতিতে বেবীর মোটর ছুটে চলেছে। নিবিড় অন্ধকার চারদিকে। হেডলাইটের তীব্র আলোয় সম্মুখের পথটা প্রেতলোকের মত পাণ্ডুর। গাড়ীর ভিতরের আলোটা ড্রাইভার এক সময় জ্বেলে দিয়েছিল, কিন্তু বেবী বারণ করাতে আবার নিভিয়ে দিয়েছে।

গভীর অন্ধকারে পাশাপাশি বসে আছে বেবী আর সমীরণ! দুজনেই কোন কথা কইছে না। সমীরণ যে ইচ্ছে ক'রে কথা কইছে না এমন কথা মনে করলে ভুল করা হবে। কথা কইবার ওর সাহস নেই! এই চলমান্ নিস্তব্ধতার অন্তরে সঞ্চিত হয়ে উঠছে যে অকথিত বাণী আর অপ্রত্যাশিত আবেগ, কথা কইতে গেলেই হয় তো তা ফেটে পড়বে। সমীরণ চুপ ক'রে বসে মনে মনে থর্‌থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলো।

হঠাৎ বেবী অন্ধকারের মধ্যে ওর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলো। তারপর আস্তে আস্তে সে হাতের ওপর একটু চাপ দিয়ে ডাকলো—

—সমী !…কী মিষ্টি ওর ডাক !

—উঁ। বহুকষ্টে সমীরণ উচ্চারণ করলো।

—ভয় করছে বুঝি ?

—না।

—তবে তুমি কথা কইছোনা কেন ? বেবী সমীরণের দিকে একটু সরে এলো।

সমীরণ বিব্রত হয়ে উঠলো। কারণ যে সব কথার হ্যাঁ-না দিয়ে জবাব দেবার উপায় নেই, সে সব কথা বেবীর সঙ্গে কইতে ওর শক্তিতে কুলোবে না। কিন্তু বেবী তাকে বিপদে ফেলবার জন্য এমন প্রশ্নই করেছে যে জবাব তাকে দিতেই হবে; অথচ জবাব দিতে গেলেই রাশি রাশি কথা উত্তর-প্রত্যুত্তরে আনাগোনা করতে থাকবে।

গুড্-সমীরণ ! গুড্ কে বলে বুদ্ধি নেই ! তবে বেবীর কথার জবাব দিয়োনা—স্রেফ চুপ করে থাকো, দেখইনা বেবী কি করে ?

—সমী !

—উঁ !

—তোমাকে আজ কেন বেড়াতে নিয়ে এলাম, তা কি তুমি বুঝতে পারছো না ?

—না তো !

—জানি, তুমি বড্ড ছেলেমানুষ ! বেবী অকস্মাৎ চুপ করলো।

গাড়ীর চাকা থেকে ক্রমাগত একটা একটানা চাপা আওয়াজ উঠছে। দু ধারে দ্রুতবেগে পার হ'য়ে যাচ্ছে অন্ধকার গাছের শ্রেণী; বাঁদিকের আকাশটা হঠাৎ খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। চাঁদ উঠছে বুঝি ?

—সমী।

—বলুন।

—আচ্ছা, আমাকে 'আপনি' বল কেন তুমি? কই আমি তো বলিনে। আর বলোনা—বুঝলে?

সমীরণ চুপ করে রইলো। তার হাতটা তখনও বেবীর হাতের মধ্যে। ধীরে ধীরে সে হাত এখন পরের বলে মনে হচ্ছে। ক্যালিফোর্ণিয়ান পপির গন্ধে সমস্ত পরিবেশ হয়ে উঠেছে কামনা-মন্দির! ওই একটি মাত্র সুগন্ধ ফিরে ফিরে সমীরণকে বেবীর কথা ভুলতে দেয়না, তার সম্বন্ধে একটা অজানিত আশঙ্কা ওর মনের মধ্যে জড়ো ক'রে তোলে। ক্যালিফোর্ণিয়ান পপি ব্যবহার করে বেবী, আর মীরা করে জেঁস্‌মিন। তাইত মীরা ঘরে ঢুকলেই পূবে হাওয়া বওয়া সজল আষাঢ় সন্ধ্যার কথা মনে হয় সমীরণের!

দু পাশ দিয়ে অন্ধকারের স্রোত কেটে তাদের মোটর ছুটেছে। কথা কইবার অনেক শুভ মুহূর্ত্ত অকারণে বয়ে যায় বুঝি! বেবী আরও কাছে সরে এসেছে, তার শাড়ীর স্পর্শ লেগেছে সমীরণের জামায়। এই যে কথা না বলা, এই যে চুপচাপ হাতে হাত রেখে বাক্যহীন হয়ে সামনের অন্ধকারে চেয়ে থাকা,—এ ভাল নয় সমীরণ! এতে মনের কল্পনাকে আরও গভীর অতলে তলিয়ে যাবার সুযোগ দেওয়া হয়; অনেক আকাঙ্ক্ষা—ধীরে ধীরে মাথার মধ্যে জমে উঠতে থাকে। ঘটনা এগিয়ে যায় আরও দ্রুততালে। এই নির্ব্বাক বিরতিকে ভেঙে দাও সমীরণ, চুরমার করে দাও বেবীর সুযোগ অন্বেষণকে। যা'হোক কিছু কথা কয়ে এই নিঃশব্দতাকে চেতন করে তোলো—তাহ'লেই দেখবে বেবী তোমার হাত ছেড়ে দিয়েছে। নইলে আজ তোমার রক্ষা নেই।

পাটনা থেকে পালিয়ে কোলকাতা চলে আসার উদ্দেশ্য আজ এখনি তোমার ব্যর্থ হবে !

বেবী সমীরণের হাতখানি নিজের কোলের কাছে তুলে নিলো,—তারপর আস্তে আস্তে বললো—

—সমীরণ, আমি তোমাকে ভালবাসি ! ভয়ে সমীরণের মুখ এক সেকেণ্ডে বিবর্ণ হয়ে উঠলো। বেবী অন্ধকারে তা দেখতে পেলো না ; বলে চললো—

—সমীরণ ! বিশ্বাস কর আমাকে ! তোমাকে দেখবামাত্র আমার মনে হয়েছিল তুমি সুন্দর পুরুষ—শুভ্রতায় আর সৌন্দর্য্যে যে দিবারাত্র ঝলমল করছে। যার মুখে নেই—

—বেবীদি ! সমীরণ অস্ফুট স্বরে বললো।

—আস্তে সমীরণ—ছি ! ড্রাইভারটা শুনতে পাবে। কি একটা হয়তো করছি—ভাববে ! খিল্ খিল্ করে বেবী এখানে নিজের মনেই হেসে উঠলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো—

—আমি জানি সমীরণ, তোমার মন আমার দিকে নেই। তোমার মন পড়ে আছে মীরার কাছে। কিন্তু সে আমার ছোট বোন ; তার কাছে পরাজয় স্বীকার করবো—এত ভাল আমি নই। একটু থেমে বেবী আবার বলতে লাগলো—তোমাকে নির্জ্জনে নিয়ে গিয়ে আমার এই কথা ক'টা বলবার জন্য আমি কি কম চেষ্টা করেছি ? অথচ মীরার তো দেখি সে সময়টুকু পাওয়ার অভাব হয় না ! তাইতো আজ মাকে বলে এই ব্যবস্থা করিয়েছি ! ভাল লাগছে না সমীরণ ?

সমীরণ প্রাণপণে 'না' বলবার একটা চেষ্টা করলো, কিন্তু মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোল না।

—আমি জানি তোমার এ ভাল লাগবে না। এখানে থাকতো যদি আমার জায়গায় মীরা,—তাহ'লে এখনি তুমি আলাপে মুখর হয়ে উঠতে? কিন্তু সমীরণ! একটা কথা জিগ্যেস করি, কিছু মনে কোরো না। মীরা কি আমার চেয়েও দেখতে ভাল?

আবার সমীরণ প্রাণপণে একটা 'হ্যাঁ' বলবার চেষ্টা করলো। না, সে পারবে না। পারবে না সে আজ কোন কথা কইতে। বেবীর হাতের আর শাড়ীর স্পর্শে—ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

—আমার কথার জবাব দাও সমীরণ!

—কী? বহুকষ্টে সমীরণ বলতে পারলো।

—মীরা কি আমার চেয়েও সুন্দরী? সমীরণকে চুপ করে থাকতে দেখে বেবী একটু হেসে বললো—তুমি জান না,—আর জানবেই বা কোত্থেকে—তুমিতো সেদিন এসেছ! কোলকাতায় আমার কত—কিন্তু যাক সে কথা। এখন বল—তুমি আমাকে ভালোবাস কিনা!

সমীরণ! তোমার মুখে জবাব কই? তোমার মত মূর্খকে, অব্যবস্থিতচিত্তকে আমার উপন্যাসের নায়ক করাই হয়েছে ভুল। তোমার সুন্দর চেহারা হাওড়া ষ্টেশনে দেখে আমি ভুল করেছিলাম। বেবীর সঙ্গে আসতে আমি তোমাকে বারণ করেছিলামনা? বলিনি আমি, আজ তোমার অত্যন্ত দুর্দ্দিন,—এখন?

সমীরণ বিমূঢ়ের মত ফ্যাল্ ফ্যাল করে বেবীর মুখের দিকে চেয়ে আছে। যেন তার বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে গেছে। অপার্থিব একটা কিছু দেখলে মানুষের প্রায় এই ধরণের চেহারা হয়।

—দিদিমণি! বড্ড মেঘ করেছে, জলঝড় হতে পারে। গাড়ী ঘুরিয়ে নেবো? ড্রাইভার বললো—

—তাই নাও।

গাড়ীর গতি ঘুরে গেল। বন্ বন্ করে আবার গাড়ী কোলকাতার দিকে ছুটলো···

—বল সমীরণ! বেবী আবার বললো।

সমীরণের অনেক দিন আগের একটা কথা হঠাৎ মনে পড়লো। পাটনায় তখন সে থার্ড ক্লাসে পড়ে। পাশের বাড়ীর রেবা তার বন্ধু। একদিন কী একটা কারণে রেবার মা সমীরণকে খুব তিরস্কার করেন। ছল ছল চোখে কথা ক'টি শুনে যখন সে তাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছিল—এমন সময় বাগানের ওপাশ থেকে রেবা তাকে ডাকলো। সমীরণ গিয়ে দাঁড়াতেই রেবা প্রবল বলে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলো,—তারপরে হু হু করে কেঁদে উঠলো।

—সমীদা?

—কী রেবা?

—মা'র কথায় তুমি রাগ করতে পাবে না সমীদা? বল রাগ করোনি?

—না।

—বল রোজ আসবে? সমীরণ চুপ করে আছে দেখে রেবা তার হাত দুটো ঝাঁকিয়ে বললো—

—বল সমীদা!

—কিন্তু মা যে—

—তা জানি, কিন্তু সমীদা, মার বয়স হয়েছে, তিনি কি বলতে কি বলেছেন তার ঠিক নেই। তুমি বল সমীদা আসবে?

—আসবো।

আজ যখন তার হাত দুটি বুকের কাছে তুলে সেই রকম মিনতির সুরে বেবী বলছে—বল সমীরণ বল, আমাকে ভালোবাস কি না, তার সুরটাও ঠিক ঐ একই রকমের। বোধ হয় মেয়েদের অনুরোধের সুরটাই ওই। ওরা ওই একই সুরে আসতে বলে, ভালবাসতে বলে, খেতে বলে আর বেরিয়ে যেতে বলে।

- সমীরণ! তুমি কি পাথর? আমি যে এত ডাকছি শুনতে পাচ্ছো না?

—পাচ্ছি বেবীদি! কিন্তু—

—কিন্তুর কথা আমি জিগ্যেস করিনি সমী! আমি শুধু জানতে চাই—তুমি আমাকে ভালোবাস কিনা!

সমীরণ তবুও চুপ করে আছে দেখে—বেবী আবার কথা কইলো। এইবার তার সুরে কান্না ছল ছল করছে।

—নির্লজ্জের মত তোমার কাছে প্রেম নিবেদন করে—এই কি আমার পুরস্কার মিললো সমীরণ? এর পরে লোকের কাছে আমি মুখ দেখাব কী করে? আমার এত বড় দম্ভ আজ এমনি করে ধূলিসাৎ হবে?…না, তা হবে না তোমাকে বলতেই হবে তুমি আমাকে ভালবাস কি না? বল! বল!

- বাসি।

—ভাল করে বল, সমী, স্পষ্ট ক'রে উচ্চারণ কর!

বাসি বেবীদি! সমীরণ ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু করলো।

বেবী এক মুহূর্ত্ত কি ভেবে নিলো; তারপর ধীরে ধীরে ওর

হাতটা নিজের মুখের কাছে তুলে নিঃশব্দে একটি চুম্বন করলো! একদিন অসাবধানে একটা সুইচ্ টানতে গিয়ে সমীরণের 'শক্' লেগেছিল, আজ এই মুহূর্ত্তে তার সেই অনুভূতি। হাতখানা সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেছে, বেবীদি যদি দয়া ক'রে হাতখানা ফিরিয়ে না দেয় তবে ও হাত জোর করে আর সে নামিয়ে আনতে পারবে না।

—সমী!

—উঁ! কান্নার বেগে ওর সমস্ত শরীর কাঁপছে।

—কাঁদছো কেন সমীরণ? আমি তো জোর করে কিছু আদায় করিনি তোমার কাছ থেকে, তবে কাঁদছো কেন সমীরণ? সমীরণ তবুও কাঁদতে লাগলো—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে···

হায় সমীরণ! আমি তখনি তোমাকে বারণ করেছিলাম···

## [ পাঁচ ]

তার পর—?

তারপরে আর বিশেষ কিছু ঘটলো না। স্তম্ভিত, হতবাক্ সমীরণকে বেবী যখন গাড়ী থেকে বাড়ীর দোরে এসে নামতে বললো — রাত্রি তখন প্রায় এগারোটা। তারাও বাড়ী পৌঁছলো— আর জল-ঝড়ও আরম্ভ হ'ল। পথের মাঝে জলঝড় আরম্ভ হ'লে হয়তো অন্ধকার গাড়ীর মধ্যে ওদের রোমান্সটা আরো গাঢ়তর হতে পারতো। কিন্তু তারাও নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী পৌঁছলো আর সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড়বৃষ্টিও আরম্ভ হ'ল। বিধাতা স্বয়ং সমীরণের ভার নিয়েছেন। ওর জীবনের গতিপথকে তিনি স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত করছেন বলে আজকের এই দুর্য্যোগ কিছু বিলম্বে এলো।

খাওয়া শেষ ক'রে ক্লান্তপদে সমীরণ যখন শোবার ঘরে এলো—তখন তার মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করছে। খুব নেশা করলে মানুষের যেমন একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন আলস্য দেখা দেয়— অনেকটা তেমনি। বিছানায় শুয়ে পড়তেই কাণে ভেসে এলো বাইরে ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দ আর বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ঝম্‌ঝমানি।

······মায়ের কথা মনে পড়ছে সমীরণের।—ওরে সমী! মাথার জানলাটা বন্ধ ক'রে দে বাবা, বড্ড বিষ্টি এলো। ঘর দোর সব ভেসে যাবে।···ঘুমজড়িত চোখে জানলা বন্ধ করতে উঠে সমীরণের মুখে লাগতো এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস, আর বৃষ্টির ছাট। চোখ দুটোকে সামান্য একটু ফাঁক করলেই ক্ষণ-বিদ্যুৎ

আলোতে দেখা যেত রেবাদের বাড়ীর ছাতের উপর কী বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি হচ্ছে। নল দিয়ে নীচে জল লাফিয়ে পড়ছে, তারই একটানা একটা ছড়্ ছড়্ শব্দ…।- সমীদা মুড়ির ছোকা খাবে? মুড়ির ছোকা?—আচ্ছা আনো। আর দেখ রেবা, তাতে কিন্তু পেঁয়াজ আর লঙ্কাটা একটু বেশী দিও।—আচ্ছা, আচ্ছা, থাক্ মশাই আমাকে আর শেখাতে হবে না। …রাতদিন এই রকম ঝম্ঝম্ ক'রে বিষ্টি হয়—তাহ'লে বেশ ভাল হয়, না সমীদা? জলের ছাঁট আসছে? শার্শীটা বন্ধ ক'রে দেবো? আচ্ছা…

শার্শীটা বন্ধ করা হয়েছে, তবুও জলের ছাঁট আসছে?… আসুক গে !

সমীরণ! আচ্ছা থাক, তুমি ঘুমোও!

পরদিন দুপুর বেলায়, সমীরণ যখন একলা বসে আছে তার বাইরের ঘরটিতে, এমন সময় শৈলেন এসে হাজির। শৈলেন হচ্ছে সমীরণের নতুন-পাওয়া বন্ধু। ওর চেয়ে বছর কয়েকের বড়। কথা-বার্ত্তায়, চাল-চলনে, আদব কায়দায়—একেবারে যাকে বলে চোস্ত ছেলে। সমীরণের সঙ্গে ওর আলাপ হয় হাজরা রোডের মোড়ে। মীরার জন্য সে কুরুশকাঠি কিনতে গিয়েছিল, হঠাৎ পয়সায় কিছু কম পড়ে। সেই সময় এই শৈলেন সেখানে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ অযাচিতভাবে ওকে পয়সা দিয়ে ওর মুখ রক্ষা করে। সেই থেকেই শৈলেনের সঙ্গে সমীরণের খুব ভাব। শৈলেনকে সে এ বাড়ীতে নিয়ে এসে রেবী, মীরা প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ হ'লে বুঝতে পারতো

যে ও ইতিমধ্যেই ওর বাক্‌পটুতায় বেবী আর মীরাকে মুগ্ধ করতে পেরেছে। সমীরণ বললো—কিগো এমন অসময়ে ?

—হাতে কোন কাজ নেই, তাই তোমার শরণাপন্ন হ'তে হ'ল। শৈলেন বললো গম্ভীর মুখে।

—কেন ? আমি কি কোন অফিসের বড়বাবু ?

—নিশ্চয়। জীবনের সুযোগ-সুবিধার জন্য তোমার কাছেই তো …।

—অর্থাৎ ?

—থাক্, সে কথা আর বলে কাজ নেই। সব কথা যে খুলেই বলতে হবে এত বড় শপথ কেউ করে না। অতএব আমার কথাটাও খুলে না বললে চলবে।…বেবীদি কোথায় ?

—জানি না।

—মীরা ?

—ওই একই উত্তর। খুলে বলতে নেই।

—বেশ। কাল বিকেলে ওদের নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলে ?

—না।

—কেন ?

—খুলে বলতে নেই। সমীরণ হেসে উঠলো।

—আমার ওপর শোধ নিচ্ছ—কেমন ? 'গুড্ আর্থে'র মত ভাল ছবি বহুকাল কোলকাতায় আসেনি। একথা আমি বারম্বার বলা সত্ত্বেও তুমি যেতে পারলে না কেন, ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি। পল মুনি আর লুই রেণার—

—থাক্ ভাই, উৎসাহ নেই। তুমি বরং ততক্ষণ দেখ

বেবীদি আর মীরা কোথায় গেল! আজ সকালেই বেবীদি তোমার কথা বলছিল—

—তাই নাকি? কি বলছিল?

—মনে নেই।

—মনে না থাকাটা অন্যায়। এই সামান্য কথা ক'টা দয়া ক'রে মনে রাখতে পারো না? ছিঃ! দেখ দেখি মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ জমে রইলো।

—ভাই শৈলেন, তোমাদের এই মনের ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি না। আমার মনে হয়—

—এই যে শৈলী এসেছ? বলতে বলতে বেবী ঘরে ঢুকলো, আর সঙ্গে সঙ্গে সমীরণ স্পর্শদুষ্টা লজ্জাবতী লতার মত গেল কুঁকড়ে। বসবার ভঙ্গী এলো সঙ্কুচিত হ'য়ে, মাথাটা অনাবশ্যকভাবে ঘরের মেঝের দিকে ঝুঁকে পড়লো। সমীরণের এই অদ্ভুত অবস্থাটা কিন্তু বেবীর চোখ এড়াল না, সে আড়চোখে একবার ওকে দেখে নিয়ে মনে মনে বোধকরি একটু হাসলো, তারপর শৈলেনের দিকে চেয়ে বল্‌লো—

—তারপর শৈলী! খবর কী? জান বোধ হয় কাল আমরা মেট্রোয় গিয়েছিলাম! সত্যি, 'গুড্ আর্থ' ভাল ছবি। বেবী চুরি করে আর একবার সমীরণের দিকে চেয়ে নিলো।

—সেকি! শৈলেন যেন আকাশ থেকে পড়লো। তবে যে সমী বললে কাল আপনাদের যাওয়া হয়নি?

—সমী এই কথা বললে বুঝি? বেবী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো।—তবে নিশ্চয় যাওয়া হয়নি।··· তোমার যেমন আক্কেল! কোন বুদ্ধিতে যে তুমি সমীরণের সঙ্গে আমাদের সিনেমায় যেতে

বললে,—তাই ভাবি। ও হ'ল গিয়ে আমাদের ভাসুর! ও কি আমাদের সিনেমায় নিয়ে যেতে পারে?

প্রবলবেগে শৈলেন বলে উঠলো—সত্যি, বেবীদি মাঝে মাঝে এমন এক একটা কথা বলেন যে, হাসতে হাসতে দম আট্‌কে যায়!—সমী কিনা আপনাদের ভাসুর! হোঃ, হোঃ, হোঃ, হোঃ! বাস্তবিক, এত সুন্দর রেডি উইট্ আপনি করতে পারেন!

—তা নয়তো কি? বেবী বললো।—উনি কাল বিকেল পাঁচটা থেকে এমনি ষ্টাডিতে মনোনিবেশ করেছেন যে, সেই ষ্টাডি-ব্যূহ ভেদ ক'রে এই ঘরে ঢুকি—এমন সাধ্য কি? আর তা ছাড়া আমরা কাছে এলেই উনি এমনি ব্রীড়াসঙ্কুচিতা হয়ে পড়েন—তা আর বলবার নয়! ছ'টার সময় এন্‌গেজ্‌মেণ্টের কথা ভুলে গিয়ে যে পড়ার ভাণ ক'রে ঘরে বসে থাকতে পারে, তাকে নিয়ে জগতে কি ভাল কাজ হবে—বলতো শৈলী!

—এক্‌স্যাক্টলি! আচ্ছা বেশ, তবে আজকে আমার সঙ্গে চলুন আপনারা?

—উইথ প্লেজার!—তোমার সঙ্গে গিয়ে আনন্দ আছে। তোমার মধ্যে ওর মত কন্‌জার্‌ভেটিজম্ নেই। একটু শাড়ীর আঁচল গায়ে ঠেকলে উনি একেবারে কদম ফুলের মত কণ্টকিত হ'য়ে উঠবেন; এ অপমান আমাদের সহ্য হবে না। আর মনে কর, একসঙ্গে গাড়ীতে যেতে গেলে গায়ে গা তো একটু ঠেকবেই!

—নিশ্চয়ই! উৎসাহের সঙ্গে শৈলেন বল্‌লো। তবে আজকেই ছটার শোতে? কি বলেন বেবীদি? রাজীতো?

—হ্যাঁ-আ!

—তাহ'লে আমি গাড়ী নিয়ে আসবো?

—বেশ। আর দেখ, ড্রাইভার এনো না। তুমি নিজেই চালাবে!

—তাই হবে। তাহ'লে আমি যাই বেবীদি— ?

—যাও!

—মীরাকে আপনি বলে দেবেন, আমার সঙ্গেতো..দেখা হ'ল না।

—নিশ্চয়।

দুজনেই ঘর থেকে গেল বেরিয়ে, আর স্থাণুর মত সমীরণ চেয়ারটায় বসে রইলো। কী রকম যে হচ্ছে মাথার মধ্যে। কী হচ্ছে সমীরণ? রাগ? হিংসা? চটছো কার ওপর?···ওখানা কি বই মন দিয়ে পড়বার চেষ্টা করছো সমীরণ? সিকাগো বক্তৃতা? হ্যাঁ, তাই পড় সমীরণ! বিবেকানন্দ সিকাগো গিয়ে কি করেছিলেন—সে কথা পড় তুমি; আর তুমি কোলকাতায় এসে কি করলে—সে কথা লিখি আমি। যার যা কাজ!

[ ছয় ]

এই ঘটনা সমীরণের মনে একটা স্থায়ী দাগ রেখে গেল। অন্তরের পুঞ্জীভূত একটা বিক্ষোভ যেন প্রকাশের পথ পাচ্ছে না,—মনের গভীরতম গহ্বরে যেন সে তার ল্যাজ আছড়াচ্ছে। বই হাতে ক'রে সমীরণ চুপ ক'রে বসে রইল—এই মুহূর্ত্তে কিছু যে একটা করবে তারও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

শৈলেন কত অবলীলাক্রমে জয় ক'রে ফেলেছে বেবীকে! সেই শৈলেন, যাকে সে নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিল এই বাড়ীতে' পরিচয় ক'রে দিয়েছিল বেবী আর মীরার সঙ্গে! লাজরক্ত মুখে মাথা নীচু ক'রে শৈলেন বসেছিল ওই চেয়ারাটায়। বেবী জিগ্যেস করেছিল—

—আপনার এত লজ্জা কেন?

- লজ্জা! আমার? সেকি।

—হ্যাঁ। তাইতো দেখতে পাচ্ছি।

—চোখে যেটা দেখা যায়, সব সময় সেটাই সত্যি নয়—এ কথা মানেন তো?

—মানি।

—তাহ'লে অপেক্ষা করুন। দুদিন পরেই বুঝতে পারবেন, নির্ল্লজ্জতায় আমি আপনাদেরও লজ্জা দিতে পারি।

—বারে! আপনি দেখছি বেশ কথা কইতে পারেন! আপনার বন্ধুকে কিছু ধার দিন না!

—কী? লজ্জা।

—আপনার বাক্‌পটুতা! তাহ’লে আমরা বেঁচে যাই!

—কেন, সমীরণ কি এতই ?

—হায়, হায়! ওর কথা আর বলবেন না। ওই দেখুন না - আপনার সঙ্গে কথা কইছি, ও কোন দিকে চেয়ে বসে আছে, দেখুন না! বলেই বেবী খিল্ খিল্ ক’রে হেসে উঠেছিল।

সেই শৈলেন! বেবীর সমস্ত হাসি আর সমস্ত গোপনতা ও আজ জয় ক’রে বসে আছে। বিজয়ীর গর্ব্ব আজ ফুটে উঠেছে ওর সমস্ত গতিভঙ্গীতে। যেন একটা বিদ্রূপের হাসি রাত্রিদিন উদ্যত হয়ে আছে ওর মুখে। এ বিদ্রূপ কাকে? সমীরণকে?…

নারীকে জয় করা কি খুব একটা শক্ত ব্যাপার নাকি? কিছুই নয়। অতি তুচ্ছ। সামান্য একটু মুখের কথা, ঈষৎ একটু হাসি—ক্ষীণ একটু মনবেদনার ভাণ—ব্যস্! কিসের গর্ব্ব শৈলেনের? আচ্ছা বেশ, আজ সমীরণ দেখিয়ে দেবে কি ক’রে বেবী আর মীরার চিত্ত জয় করতে হয়! শৈলেনের কাছ থেকে বেবী আর মীরাকে ছিনিয়ে আনতে বিশেষ বলের দরকার করে না। অতি অনায়াসে সমীরণ সে কাজ করতে পারে।…সমীরণ বুঝতে পেরেছে, বেবীকে জয় করতে হ’লে প্রথমে বেবীকেই জয়ী হবার সুযোগ দিতে হবে! বেবী যখন বলবে—সমীরণ সত্যি ক’রে বল, তুমি আমাকে ভালবাস কিনা? একটুও না ভেবে তখনই চট্ ক’রে জবাব দিতে হবে—বাসি বেবীদি! চোখ দুটো কোমল ক’রে আর ছোট ক’রে চাইতে হবে বেবীর দিকে—মুখের রেখায় জিইয়ে রাখতে হবে মধুর একটু ক্ষীণ হাসি। কথায় কথায় বলতে হবে—বেবীদি! জীবনে অনেক সুন্দরী মেয়ে

দেখেছি—কিন্তু তোমার মত এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী আর আমার চোখে পড়লো না! এই চোখে না পড়ার নিশ্চয়োক্তি—এই স্তুতি মেয়েদের বড় প্রিয়। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছে সমীরণ।

আজই ওর এই শক্তির প্রয়োগ করতে হবে বেবীর ওপর। নইলে শৈলেনের কাছে পরাজিত হতে হবে ওকে। আর তা ছাড়া ক্ষতিও তো নেই কিছু এতে। সে এ বাড়ীর প্রাইভেট টিউটার—এসেছে মিণ্টুকে পড়াতে—বেবী-মীরার সঙ্গে প্রেম করতে নয়!

প্রেম! কোথাকার? মনের, না মুখের, না দেহের? না বুঝে পৃথিবী শুদ্ধ লোক ওই একটা কথা শুনতে কী কাণ্ডই না করছে! কেউ বিষ খাচ্ছে, কেউ জলে ঝাঁপ দিচ্ছে, কেউ গলায় দড়ি, কিম্বা কাপড়ে কেরোসিন ঢালছে। অথচ এর মূলে তো মাত্র একটি শব্দ। দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, ক্যাবলা-হাবলার মতই মানুষের তৈরী করা শুধু একটা শব্দ! যাক্‌গে সে কথা। সমীরণ যখন ঠিক করেছে বেবীকে জয় করবে—তখন বেবীকে জয় সে করবেই। কোন দরকার ছিল না জয় করার, মানে জয় না করলেও সমীরণের অন্ন দেখা দিত না। কিন্তু শৈলেনের বাঁকা হাসি আর তার সহ্য হবে না—যে বন্ধু-প্রীতি তাকে এ বাড়ীতে টেনে নিয়ে এসেছিল—তারই শক্তিতে সে এখান থেকে চলে যাবে।

সশব্দে বইটা বন্ধ ক'রে টেবিলের ওপর রেখে সে সোজা হয়ে বসলো। হ্যাঁ এইবার সে ঠিক ক'রে ফেলেছে—বেবীর সঙ্গে সে খেলো প্রেম করবে। কারণ বেবী তাই চায়। অত্যন্ত স্থূল, অত্যন্ত বাস্তবের প্রতি ওর পরম তৃষ্ণা। শৈলেনকে এবাড়ী থেকে তাড়াবার জন্য সমীরণকে এই অভিনয় করতেই হবে।

দুর্ভাগ্য সমীরণের—

বেবী ঘরে ঢুকে দেরাজ থেকে কী একটা বই বার করলো। তারপর ঘুরে ঘুরে এটা ওটা নাড়াচাড়া করতে লাগলো। বেশ বোঝা গেল এ ঘরে সে শুধু বইটা নেবার জন্যই ঢোকেনি। অন্য কাজও আছে।

তার ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সমীরণ টেবিল থেকে সিকাগো বক্তৃতাখানা আবার তুলে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলো। পুস্তক পাঠে তার এমন তন্ময়তা বহুকাল দেখা যায়নি।

বেবী সমীরণের কাছে এসে দাঁড়িয়ে একবার পাঠনিরত তার মুখখানার দিকে চেয়ে মনে মনে বোধ করি একটু হাসলো! তারপর বললো—

—তুমি কি যাচ্ছো নাকি আমাদের সঙ্গে?

—কোথায়? সমীরণ যেন আকাশ থেকে পড়লো।

—মেট্রোয়। 'গুড্ আর্থ' দেখতে!

—আমি—আমি—এই প্রথম সমীরণের তোৎলামি দেখা দিলো।

—হ্যাঁ গো তুমি! তোমারই অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে আমরা যাচ্ছি সিনেমায়। একটু ভয় হয় না তোমার?

—ভয়, কিসের ভয়?

—ভূতের! বেবী জ্বলে উঠলো।—প্রত্যেকটি কথাই তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে—এত মাথাব্যথা আমার হয়নি। যাবে কি যাবে না—এই কথাটাই আমি শুনতে চাই।

—আমি—আমি—, বাক্যটা শেষ করার চেষ্টায় সমীরণের মুখচোখ লাল হয়ে উঠলো, কপালে দেখা দিল ঘামের রেখা।

—তুমি মর! রাগ ক'রে বেবী ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সমীরণ ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে চেয়ে দেখলো—সত্যিই বেবী চলে গেছে কিনা!···তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে কোঁচার খুঁট দিয়ে কপাল আর মুখটা ভাল ক'রে মুছে বইটা আবার টেবিলে রেখে দিল।

ভাগ্যিস্! হাতের কাছে বইখানা ছিল!

মেট্রো থেকে ফিরে বেবী সটান নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। মাকে বলে গেলো রাত্রে কিছু খাবে না। কিন্তু মায়ের প্রাণ সেকথা মানে না। বেবীর পেছনে পেছনে তিনি ঘরে ঢুকে আবিষ্কার করলেন—তার জ্বর হয়েছে। কদিন থেকেই ওর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, মনে মনে এই কথাটা আওড়াতে আওড়াতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

মীরা অদ্ভুত মেয়ে। সমীরণের সম্বন্ধে সে যেন একেবারে বোবা হয়ে গেছে। যেদিন বেবী সমীরণকে নিয়ে ডায়মণ্ড হারবার বেড়াতে গেছলো, সেদিন থেকে ও সমীরণকে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করেছে। সময় সময় এমনও দেখা গেছে যে মুখোমুখি দেখা হ'য়ে যাবার পরও মীরা সমীর সঙ্গে কথা কয়নি! কিন্তু মজা এই যে, তার এই নীরবতা সমীরণকে আঘাতও করেনি। মানে—এটা যে একটা লক্ষ্য করবার বিষয়, এ কথাই মোটে তার মনে হয়নি। তাই সেদিন খেতে যাবার সময় রাত্রে সে যখন মীরাকে বারান্দায় দেখলো তখন হঠাৎ জিগ্যেস করলো—

—কেমন আছ মীরা?

—ভালই আছি সমীদা।

—তোমার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি কেন ?

— সেকি ! আজ সকালেও তো তুমি আমাকে দেখেছো !

—তাই নাকি ? তা হবে। লক্ষ্য করিনি তাহ'লে !

সমীরণ খেতে চলে গেল, মীরা ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলে মায়ের ঘরের দিকে চলতে লাগলো। মীরার মধ্যে একটি ঔদাস্য এসেছে,—সন্ন্যাসীর মত একটি গৈরিক বৈরাগ্য। অন্তরের অন্তরতম গভীরে কী যে পেলো সে বেদনা, কে যে দিলো তাঁকে আঘাত, সেকথা রইলো বিধাতার মনে, কিন্তু মূক সমীরণের চোখেও কি সে নির্লিপ্ততা ধরা পড়লো না ? মীরার ভালোবাসার স্নিগ্ধ স্পর্শ এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি তার ক্লান্ত ললাটে লাগেনি ? অভিমানাহত রূপসী মীরা—সমীরণের চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়,—অন্ধ সমীরণ তা দেখতে পেলো না ! হায়রে !

কিন্তু কী করা যাবে ? জগতে এমন কতোই তো হয় ! কত ব্যর্থ আশা,—কত চ্যুত মুকুল, কত স্তব্ধ গান, যে মহাদেবতার শান্ত চরণ প্রান্তে গিয়ে পরম সান্ত্বনা লাভ করে,—হয়তো মীরার সদ্য জাগ্রত প্রেমও সেই তীর্থ পথের যাত্রী হ'ল। অন্ধকার ঘরের নিভৃত শয্যায় শুয়ে সজল চোখে হয়তো পরস্পর পরস্পরকে স্মরণ করবে, কিন্তু সন্নিকটবর্ত্তী হতে পারবে না। এই বিধাতার বিধান। এই হয়, এবং এ হবেই !

সমীদা ! মীরা মনে মনে উচ্চারণ করে। তোমাকে দেখে আমি ভালবাসতে শিখলাম, কিন্তু আমার ভালবাসা তোমার চেতনায় ধরা পড়লো না। অত্যন্ত ভীরু বুকে একটু একটু ক'রে আমি তোমার দিকে এগিয়েছিলাম—কিন্তু বাধা পেয়ে ফিরে এলাম কঠিন পাষাণে !···তুমি মিশলে গিয়ে দিদির সঙ্গে—

ভালবাসার বাসা যার অনেকবার ভেঙেছে, জীবন নিয়ে যার নব নব দুঃসাহসিক পরীক্ষা। কত লোক যে নিঃশব্দে ব্যর্থকাম হয়ে ফিরেছে ওখান থেকে—সে খবর রাখলে তুমি আর এক পা ও অগ্রসর হতে পারতে না সমীদা! তোমাকে আমি একবার সাবধান করেছিলাম—আর একবারও সাবধান করতে পারতাম; কিন্তু জানি তোমাকে ভালবাসার কথা বলাও যেমন বৃথা—তেমনি বৃথা সাবধান করা। তার অর্থতো তুমি বুঝবে না! সব কথা শুনে একটা নিঃস্পৃহ উদাসীনতায় আমার মুখের ওপর তোমার বড় বড় চোখ দুটি মেলে রাখবে।...মীরা এই সব কথা ভাবে আর চুপ ক'রে সমীরণের ঘরের দিকে চেয়ে থাকে। শুধু চেয়ে থাকা ছাড়া আর কীই-বা করতে পারে মীরা!

দুদিন পরে দেখা গেলো বেবীর জ্বর ক্রমশঃ খারাপ রাস্তা নিচ্ছে। বাড়ীশুদ্ধ সকলের উদ্বিগ্ন হবার কারণ ঘটলো। বড় ডাক্তার আসা-যাওয়া করতে লাগলেন, সকলেরই মুখে নামলো একটি আসন্ন বিপদের ছায়া।

শুধু সমীরণ—হ্যাঁ শুধু সমীরণই অত্যন্ত নির্ব্বিকার চিত্তে—যথাসময়ে খাওয়া দাওয়া আর বিশ্রাম করতে লাগলো! এই পরিবারের চাঞ্চল্য—যেন সম্পূর্ণ ভাবে—তার অজানাই রইলো! তিন তলায় তার বেবীদি যে রোগ শয্যায়—একথা একবারের জন্যও তার মনে হ'ল না। সেদিন খাবার সময় মায়ের পরিবর্ত্তে মীরা ছিল কাছে বসে। মা গিয়েছিলেন ওপরে মেয়ের কাছে।

—সমীদা! মীরা যেন কুণ্ঠিত ভাবে বললো।

—এ্যাঁ! সমীরণ ঘুম থেকে জেগে উঠলো।

— দিদির খুব অসুখ—শুনেছো বোধ হয় ?

—বেবীদির ! হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছিলাম বটে মনে হচ্ছে ! কী অসুখ করেছে বেবীদির ?—

—বোধ হয় টাইফয়েড্। আরও দু একদিন না গেলে সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

—ও ! সমীরণ আবার খেতে আরম্ভ করলো। মীরা বুঝলো, এ কথাটার এইখানেই শেষ হয়ে গেল ! কিন্তু তা হ'লো না,—হঠাৎ মুখ তুলে সমীরণ বললো—

—টাইফয়েড্, না মীরা ? রেবারও একবার টাইফয়েড্ হয়েছিল। বিশ্রী অসুখ।

সমীরণের মুখে মেয়ের নাম ? মীরা রীতিমতো চঞ্চল হয়ে উঠলো।—রেবা, রেবা কে সমীদা ?—

—রেবা ! ও সে আমাদের পাটনার একটি মেয়ে—তুমি চিনবে না। সমীরণ আবার খাওয়ায় মন দিল।

ব্যস্—এইটুকু ! কে মেয়ে, কত তার বয়স,—সমীরণের সঙ্গে কী তার সম্বন্ধ, কিছুই শোনা হ'ল না, সমীরণ খেতে সুরু করলো ! নেপথ্যে রইল হয়তো কত অকথিত বাণী, কত ব্যর্থ জ্যোৎস্নারাত্রি, কত দীর্ঘনিঃশ্বাস, কত চোখের জল ! রেবা ! হয়ত পাটনারই সে ! একবার কিন্তু জিগ্যেস করলে হয় যে, সমীদা রেবাকেই বা তুমি মনে রেখেছ কোন করুণায় ? কিন্তু—না থাক্, হয়তো উত্তর পাবে—সে তুমি বুঝবে না !

যাই হোক্ বেবীর জ্বরটা কিন্তু টাইফয়েডে দাঁড়ালোনা, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে নর্ম্মাল হয়ে গেল। ডাক্তাররা বললেন যে ভাগ্য ভাল বলতে হবে। তার কারণ তাঁরা আশঙ্কা

করছিলেন যে জ্বরটা বাঁকা পথ নেবে। সকলের মুখেই ক্রমে ক্রমে হাসি উঠলো ফুটে। এই সংসারের প্রাত্যহিক কর্ম্মচক্র আবার তালভঙ্গ না ক'রে যথানিয়মে চলতে সুরু করলো।

সেদিন হঠাৎ বেলা দুটোর সময় বেবী সমীরণকে ওপরে ডেকে পাঠালো। রবিবারের দুপুর। সকলেই খাওয়া দাওয়ার পর একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। সমীরণ বেবীর ডাকের খবরটা পেয়ে প্রথমে একটু নার্ভাস হ'ল। কিন্তু কোন কথা না বলে সে ধীরে ধীরে বেবীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

—এস সমী! ক্ষীণকণ্ঠে বললো বেবী। একটা মধুর মৃদু হাসির রেখা লেগে রয়েছে ওর মুখে।—আমার এতবড় একটা অসুখ গেল, কত লোককেই তো দেখলুম,—কিন্তু কই তুমিতো আসোনি?

—না। অপরাধীর মত বললো সমীরণ।

—অথচ তুমিই আমার সবচেয়ে প্রিয়জন! নয় কি?

সমীরণ চুপ ক'রে রইলো। কীইবা জবাব দেবে সে এই অর্থহীন উচ্ছ্বাসের। সমীরণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো বেবীর তাকে ডাকার কী যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে?

—সমী!

—কী বেবীদি!

—আমার কাছে এসে বসবে না? আমি তোমাকে এত ভালবাসি, আর তুমি—

—ওকথা থাক্ বেবীদি, আমি যাই!

—না তুমি যাবে না। বস এখানে চুপ ক'রে! বেবী ধমক দিয়ে উঠলো।—আমাকে কী ভাবো তুমি? আমি তোমার কাছে প্রেম নিবেদন করবো—আর তুমি মজা দেখবে—না?

—কই বেবীদি আমিতো—

—হ্যাঁ তুমিই! চুপ কর! তুমি আমাকে বাঁদর নাচ নাচাবে, না? তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা! তোমায় পথ থেকে কুড়িয়ে এনে বাবা অন্যায় করেছেন। ভিক্ষুক কোথাকার!...মা! মা! মা! বেবী চীৎকার ক'রে হঠাৎ মাকে ডাকতে আরম্ভ করলো। -একি! বেবীদি কি পাগল হয়ে গেলো নাকি?

—মা! মা! শীগ্‌গির এঘরে এসোতো একবার!

মীরাকে একবার ডাকলে হয় না এসময়? হল কি হঠাৎ বেবীদির?

অকস্মাৎ উত্তেজনায় বেবীর চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে। বাঁ হাতের ওপর ভর দিয়ে সে বিছানায় প্রায় উঠে বসেছে। বেবীর মা দোতালায় শুয়ে ছিলেন, বড় মেয়ের ওই এক চীৎকারেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে তেতালায় উঠে এলেন।

—ষ্টুপিড! মাকে দেখে বেবী বলতে আরম্ভ করলো।—
—তুমি বাইরে ভালোমানুষ সেজে থাকো—না? তুমি আজই আমাদের বাড়ী থেকে চলে যাবে। তোমার মত টিউটর পথে ঘাটে অজস্র মিলবে!

—কী হয়েছে বেবী?

—সে কথা তোমার শুনে কাজ নেই মা! তুমি শুধু ওকে আজই এ বাড়ী থেকে যেতে বলে দাও! ও যেন আর এক সেকেণ্ডও এখানে না থাকে।

—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। মৃদুকণ্ঠে সমীরণ বললো।

—যাচ্ছি নয়—বেবী আবার চীৎকার ক'রে উঠলো।—এখুনি যেতে হবে। এক ঘণ্টা পরে তুমি এ বাড়ীতে আছো জানলে আমি তোমায় গলাধাক্কা দিয়ে তাড়াবার ব্যবস্থা করবো!

—তার দরকার হবে না। সমীরণ দরজার দিকে পা বাড়ালো।

—সমী! মা পেছন থেকে ডাকলেন।

—না মা! একগুঁয়ের মত মাথা নাড়তে নাড়তে সমীরণ বেরিয়ে গেল।

—ওরে বেবী, কি হয়েছে তাই বল্‌না।

—আমার শরীর ভাল নেই মা। বেবী আবার শুয়ে পড়লো।—সে কথা তুমি আর একদিন শুনো। কথা কইতে আমার কষ্ট হচ্ছে।

মা হতভম্ভ হ'য়ে খানিকক্ষণ অনাবশ্যক ভাবে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে অপ্রস্তুতের মত বাইরে চলে গেলেন।

সমীরণ ঘরে এসে সমস্ত গুছিয়ে নিলো, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে সুটকেশটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। যেতে হবে এবার...কোথায়? কোলকাতায় অবিশ্যি ইতিমধ্যেই তার দু' চারজন বন্ধু জুটেছে—কিন্তু তাদের শরণাপন্ন হওয়ার কোন মানে হয় না। অতএব কোন হোটেলে ওঠাই ভাল। কিছু টাকা তার সুটকেশে আছে এ কথা সত্যি, কিন্তু তাই দিয়ে হোটেলের খরচ কদিন চলবে? যদিনই চলুক তাই করতে হবে। কিন্তু বেবীদির এই অস্বাভাবিক আচরণের মানে কী? কোন কারণ না দেখিয়ে কেবল মাত্র গলার জোরে একটি মানুষকে

বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটা আশ্চর্য্য বটে! সমীরণ দরজা দিয়ে বার হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই পেছন থেকে একটি মৃদু ডাক এলো –

—সমীদা!

ফিরে দাঁড়িয়ে সমীরণ দেখলো মীরা। দুই চোখের কোণে তার টল টল করছে আসন্ন ক্রন্দন,—অপরাধীর মত সে সমীরণের দিকে চাইলো।

—চললে সমীদা!—

—হ্যাঁ।

—কোথায় যাচ্ছো?

—জানি না মীরা। পথে বেরিয়ে পা যেদিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাবো!

—কেন তুমি প্রতিবাদ করলেনা সমীদা? কেন তুমি বললে না যে, তোমার ওপর শোধ নেবার জন্য দিদি এই কাণ্ড করেছে?

—কী দরকার মীরা? যেমন ক'রেই হোক—তোমাদের কাছে থাকার কাল আমার ফুরিয়েছে। যা অবশ্যম্ভাবী, তাকে রোধ করার চেষ্টা বোকামী!

—যেখানেই থাকোনা কেন, তার ঠিকানা আমায় জানাবে, বল?

—জানাবো।

— আমাকে ভুলে যেও না সমীদা!

—না। ভুলবোনা,—চল্লাম! সমীরণ পেছনে না চেয়ে গট্‌গট্‌ ক'রে রাস্তায় নেমে পড়লো।

এস সমীরণ! তুমি আসবে বলে আমি তোমার জন্য পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি! অপেক্ষা করছি তোমার জন্য—কারণ তোমার সঙ্গে আমাকে যেতে হবে। বেবীদির বাড়ীতে দু' একদিন আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম, ইচ্ছে ছিল বেবীর সঙ্গে তোমার প্রণয়াঞ্চিত কাহিনী কাণে না শুনে চোখেই দেখে যাবো। দেখলাম তা হোল না, অর্থাৎ কোন আধুনিক তরুণীর প্রণয়াস্পদ হবার অযোগ্যতা যখন তুমি প্রদর্শন করলে, তখন আমি ওবাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম। জানি একদিন না একদিন বেবীর কাছ থেকে এই অযোগ্যতার দাম তুমি পাবেই; সেদিন তোমার দুর্দ্দিন। সেদিন তোমাকে অভ্যর্থনা করতে হবে বলে আমি তৈরী ছিলাম। তাই আজ হাজার কাজ ফেলে তোমার কাছে এসেছি। চল সমীরণ! বিশাল সহর কোলকাতা! এখানে থাকবার অভাব কি? বিশেষ ক'রে তোমার পকেটে যখন টাকা আছে? চল! ভেঙে পড়োনা, ভেঙে পড়লে তোমার চলবে না। কারণ বহুবার তোমায় এইভাবে বেরোতে হবে! বেরোতে হবে বাড়ী থেকে পথে, আশ্রয় থেকে নিরাশ্রয়তায়, কর্ম্ম থেকে নৈষ্কর্ম্ম্যে, প্রত্যাশা থেকে নিরাশায়।

## [ সাত ]

সমীরণ পথে নেমে একবার চারিদিকে চাইলো। অর্থাৎ কোনদিকে যাবে তা ঠিক করতে পারছে না। রাস্তাটা ডাইনে এবং বাঁয়ে সমান প্রসারিত। যে কোন দিকেই যাওয়া যায়। কিন্তু সদ্য সদ্য একটা বাড়ী থেকে বেরিয়ে, সেই বাড়ীরই সামনে দাঁড়িয়ে পথের কথা ভাবা লজ্জাকর। অতএব যে কোন একদিকে —ডাইনে হোক, বাঁয়ে হোক—গেলেই হ'ল। ক্ষতি তো কিছুই নেই। এতো আর বন্ধুর বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণে যাবার জন্য রাস্তা শর্টকাটের কথা নয়—এ হচ্ছে সম্পূর্ণ এক অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে বেহিসেবী চলা।...সমীরণ বাঁয়ে চলতে সুরু করলো।

এক জায়গায় একটা লোক কতকগুলি জাপানী ছিট বিক্রী করছে। তারই উচ্চ কলরবে লোকও জমেছে বিস্তর। সকলেরই ইচ্ছে কিছু কিছু কেনে। ছেলের জন্য, মেয়ের জন্য, স্ত্রীর জন্য, প্রিয়ার জন্য। সস্তার জিনিষ বলেই তার এত কলরব। সস্তা জিনিষের একটা মজাই এই যে, সে বড় বাচাল হয়, নইলে তার চলে না। নানা রকম সাজানো সুন্দর সুন্দর কথায় সে আত্ম-প্রচার করে, আর দামী জিনিষ লজ্জায় লাল হয়ে এক পাশে মুখ বুঁজে তার এই নির্লজ্জতার অভিনয় দেখে। তার একমাত্র অপরাধ সে দামী! বাক্-বাহুল্যে সে নিজের বিজ্ঞাপন প্রচার করতে জানে না। লোকে ভাবে বোগাস্, মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। দেশী কাপড় আর জাপানী কাপড়ে ঠিক এই তফাৎ। সমীরণ আর শৈলেনেও এই তফাৎ, ঠিক এই তফাৎ মীরা আর

বেবী দিতে। ওরা সব জাপানী মাল। নিজেদের চটুল রঙে ওরা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়, দু' ধোপের পরই বেরিয়ে পড়বে ওদের ক্ষণভঙ্গুরতা, অন্তঃসারশূন্যতা আর কুশ্রীতা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সমীরণ ওদের দলে নয়। সমীরণ চায় না ওদের মত ফাঁকা কথার আতসবাজী অন্ধকার আকাশে তুলতে—এক মুহূর্ত্তের চোখ ধাঁধানো উজ্জলতায় যার পরিসমাপ্তি। সমীরণ চায় অন্ধকার আকাশে অনন্তকাল তারা হয়ে জ্বলতে! অনির্ব্বাণ স্নিগ্ধতা আর অপরিসীম প্রশান্তি নিয়ে সে চেয়ে থাকবে এই পৃথিবীর দিকে, সহস্র কোটি পাপ, পুণ্য আর ছলনার বোঝা মাথায় নিয়ে যে পৃথিবী মহাশূন্যে নিরবধিকাল আবর্ত্তিত হচ্ছে।···

একি! বড় রাস্তায় এসে গেল যে সমীরণ! একটা বাসে উঠে পড়বে নাকি? কিন্তু যাবে কোথায় বাসে উঠে? যেখানেই যাক্ অন্ততঃ ভবানীপুরের বাইরে যাবে তো? তাহলেই হোল। এখানে আর সে থাকবে না।

তার হাতের ইশারায় যে বাসটি চট্ করে দাঁড়ালো—সেটি শ্যামবাজারের বাস। সমীরণ উঠে পড়লো, তারপর সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় গিয়ে সুটকেসটি একপাশে রেখে একটি আসনে বসে পড়লো। হু-হুঁ ক'রে বাস ছুটতে লাগলো!

বিকেল হয়ে গেছে। চারিদিকে বায়ুভুক্ লোকের আর অন্ত নেই। মাঠ লোকে লোকারণ্য। বিচিত্র সহর এই কোলকাতা! সমস্ত সহরটা যেন একটা বৃহৎ পান্থশালা। বহুলোক গায়ে গা ঠেকিয়ে এখানে বাস করছে, কিন্তু কারুর সঙ্গে কারুর সম্বন্ধ নেই। কেউ কারুকে চেনে না। মুখে যেটুকু চেনার ভাণ করে—সেটুকু বাহ্যিক, তার মধ্যে সত্য বস্তু নেই। প্রত্যেকেরই

এখানে ছোট ছোট পরিমণ্ডল আছে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আর নিজে। ব্যস্। এর বাইরে তাদের আর কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। বাপ-মা দেশে আছেন—হয়তো তাঁরা অনাহারেই কাল কাটাচ্ছেন, ভাই হয়তো মৃত্যুশয্যায়,—তা হোক্—আমার স্ত্রী পুত্রতো সুখে আছে, তা হলেই হোল! এই যে স্বার্থপরতা, এ একেবারে কোলকাতার নিজস্ব জিনিষ। বাংলা দেশের আর কোথাও এজিনিষ তুমি দেখতে পাবে না। মীরাদের বাড়ীর সামনে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি থাকেন, কোলকাতার প্রত্যেক লোকেই তাঁর নাম জানে। পরিবারের মধ্যে তিনি, তাঁর স্ত্রী আর দুটি ছেলে-মেয়ে। মাসে হাজারখানেক টাকা তিনি রোজগার করেন। একদিন দেশ থেকে তাঁর বড় ভাই এলেন দেখা করতে। বাড়ীর গিন্নী যখন শুনলেন ভাসুর এসেছেন—নীচের একটা অন্ধকার ঘরেএকখানা মাদুর বিছিয়ে দেওয়া হোল। দিন তিনেক এই ভাবে পরম অপমানের মধ্যে থেকেও যখন ছোট ভায়ের দেখা তিনি পেলেন না, তখন আবার পুঁটুলিটি নিয়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে তিনি দেশের দিকে রওনা হলেন। শোনা গেল দেশের বাড়ীঘর নীলামে বিক্রী হয়ে যাচ্ছে বলে তিনি ধনী ছোট ভায়ের কাছে কিছু অর্থসাহায্য চাইতে এসেছিলেন! এবং এই ছোট ভাইকে তিনিই মানুষ করেছিলেন নিজে বিয়ে না করে, না খেয়ে না দেয়ে জমির ধান বিক্রী ক'রে, লেখাপড়া শিখে সে তাঁদের দুঃখ ঘোচাবে বলে! হায় বড় ভাই, আর হায়রে শিক্ষা! সমীরণের দুই চোখ জলে ভরে এল।

—উতার যাইয়ে বাবু—সাম্‌বাজার। কণ্ডাক্টার হাঁক্‌লো।

বাসের সিঁড়ি বেয়ে সমীরণ ধীরে ধীরে নীচে নামলো। তারপর স্যুটকেশটা হাতে ক'রে সামনে এগোতে লাগলো। বেশ নির্জ্জন কিন্তু এই অঞ্চলটা। গাড়ী, ঘোড়া, বাস, ট্রাম, লোকজন সবই চলছে বটে, কিন্তু সকলেরই কেমন একটা স্থির মন্থর প্রকৃতি। সমীরণ বাগবাজার ষ্ট্রীটে পা দিলো। কেমন যেন একটু পল্লী-গ্রামের ছোঁয়াচ আছে কোলকাতার এই দিকটায়। একটা গ্রাম্য স্নিগ্ধতা, বালীগঞ্জের মত সে স্নিগ্ধতা রূপের অহঙ্কারে উদগ্র নয়, শান্ত সামাজিকতায় বিনম্র। এইবার একটা হোটেল দেখে নিতে পারলেই ছুটি। পকেটে যা টাকা আছে তাতে স্বচ্ছন্দে মাসখানেক মাস-দুয়েক চলে যাবে। একটা চাকরী বাকরী কি কোথাও জুটবে না? নিশ্চয়ই জুটবে। কোলকাতার ব্যাপার সমীরণ খুব বুঝে নিয়েছে। এখানে জীর্ণ জামা গায়ে দিয়ে "খেতে পাচ্ছি না" বল্লে কেউ চাকরী দেবে না; কিন্তু অনাহারক্লিষ্ট শরীরে একটা আদ্দির জামা চড়িয়ে চাকরী চাইলেই তৎক্ষণাৎ চাকরী মিলবে। এই হচ্ছে রাজধানীর রেওয়াজ। একে মেনে নিতে পারলে তোমার ভাত-কাপড়ের আর ভাবনা রইলো না।

হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো পথিপার্শ্বস্থ সাইনবোর্ডের ওপর। "রমলা হোটেল"। মস্ত বড় তিনতলা বাড়ী। রেলিংয়ে কাপড় ঝুলছে, অবশ্য শাড়ী নয় ধুতি। ভেতরে ঢুকতেই একটী মোটা লোক এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো—

—কাকে চাই আপনার?

—সীট খালি আছে আপনাদের?

—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়! কোন তলায় থাকতে চান আপনি?

ভদ্রলোকের কথার ভঙ্গী সমীরণকে কৌতূহলী ক'রে তুললো। সে পরিহাসের স্বরে বললো—

—যে কোন তলায়, শুধু মাটির তলায় ছাড়া।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কী যে বলেন! তাহলে তেতলাতেই ব্যবস্থা ক'রে দিই, কী বলেন ?

—বেশ।

—তাহ'লে আপনার লাগবে গিয়ে দশ টাকা আর পাঁচ টাকা, পনের টাকা,—আর লাইট চার্জ্জ হ'ল দেড় টাকা। তা সে যাকগে দেড় টাকা আপনি না হয় নাই দিলেন। আমাদের এখানে চীপেষ্ট্ রেট বুঝলেন ? সারা সহর এমনটি আর কোথাও পাবেন না। আসুন—তাহ'লে ওপরে চলুন। আমি আপনার ব্যবস্থা ক'রে দিই। বেডিং এনেছেন—বেডিং ?

—না তো। সমীরণ বিব্রত বোধ করলো!

—আনেন নি ? তবেই তো মুস্কিল করলেন! আপনার বেডিংএর জন্যে তাহ'লে আরও যে কিছু লেগে যাচ্ছে স্যার!

—লাগুক। কত লাগবে বলুন ? সমীরণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো।

—বারো আনা। মাত্র বারো আনা মাসে দিলেই আপনি বালিশ বিছানা সবই পাবেন। আমাদের এখানে চীপেষ্ট্ রেট বুঝলেন না ?—

—বুঝেছি। বেশ। ব্যবস্থা করুন তাহ'লে।

—যে আজ্ঞে। আপনি ওপরে আসুন।

—চলুন।

বেশ ঘরটি। দক্ষিণ দিকে গোটাতিনেক বড় বড় জানলা আছে। দুটি মাত্র সীট, একটি সমীরণের, আর একটিতে থাকে অবনী নামে একটি ছেলে। বয়স প্রায় বছর বাইশ। মার্চেন্ট অফিসে চাকরী করে। দেশে সংসারের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়াতে অল্পবয়সে পড়াশুনা ছেড়ে চাকরী নিতে বাধ্য হয়েছে। সমীরণের সঙ্গে সেই রাত্রেই তার খুব ভাব হয়ে গেল।

—তুমি আমাকে দাদা বোলো। কেমন? অবনী বললো। —তুমি আমার চেয়ে ছোট।

—নিশ্চয়। আচ্ছা আমি দাদাই বলবো। ভালই হল, আমারও নিজের দাদা নেই।

—কিন্তু একটা কথা, শুধু দাদা ডাকটাই ডাকবে, কিন্তু তার মর্য্যাদা আমাকে দিতে পারবে না। তার কারণ পরস্পর আমরা ব্যবহার করবো বন্ধুর মত। তুমি তোমার মনের কথা আমাকে বলবে, আর আমিও বলবো আমার মনের কথা তোমাকে। কেমন?—

—বেশ তাই হবে।

—আচ্ছা এবার বল, দেশে তোমার কে আছেন?

—দেশে? মা আছেন আর—। সমীরণ অকস্মাৎ থেমে গেল।—আর কেউ নেই।

—শুধু মা! অবিবাহিতা বোন-টোন নেই? বাবা মরবার সময় কোন দায়িত্ব দিয়ে যাননি তাহ'লে তোমার ঘাড়ে?

—না।

—লাকি চ্যাপ।

—আপনার কে কে আছেন দাদা?

—আমার ? সবাই আছেন। মা আছেন, দুটি বিবাহযোগ্যা বোন আছেন, আর স্ত্রী আছেন।

—স্ত্রী! সমীরণ বিস্ময়সূচক একটা শব্দ ক'রে উঠলো। —আপনি বিয়েও করেছেন এর মধ্যে!

—করিনি। করানো হয়েছে। কারণ মা বাতে পড়ে তিনি সংসারে খাটতে পারবেন না ; দুটি বোন, তারা তো পরের ঘরে চলে যাবে—তাদেরই বা খেটে কি লাভ ? অতএব খাটবার জন্য ও এঁদের সেবা করবার জন্য এলেন আমার স্ত্রী। তিনি হচ্ছেন সংসারের সেবাদাসী।

এরপরে অনেকক্ষণ দুজনেই কোন কথা কইলো না। চুপ ক'রে নিজের নিজের বিছানায় পড়ে রইলো। রাত্রি গভীর হয়েছে। এক তলায় ঠাকুর মেসের চাকরটার সঙ্গে কথা কইছে—সমস্ত বাড়ীটায় সে শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আলো নেবানো ঘরের জানলা দিয়ে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না এসে বিছানায় পড়েছে। সমীরণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুকাল সেই দিকে চেয়ে থেকে বললো।

—কী চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে দেখুন দাদা!

—জানলাটা বন্ধ ক'রে দাও। গায়ে লাগলে ফোস্কা পড়বে।

—সেকি!

—কী হবে খামোখা ওই আলোর বাজে খরচ দেখে। জানলা বন্ধ ক'রে দিয়ে চুপ ক'রে ঘুমোও। নিজের মাথার কাছের জানলাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে অবনী শুয়ে পড়লো।

ঘুম যে কিছুতেই আসছে না! অন্ধকারের মধ্যে সমীরণ চোখ মেলে শুয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে কী ভাবতে ভাবতে সে হঠাৎ প্রশ্ন করলো—

—বৌদি আপনাকে চিঠি দেয় না দাদা ?

দাদার কাছ থেকে কোনরকম সাড়া পাওয়া গেল না। সমীরণ বুঝলো অবনী ঘুমিয়ে পড়েছে। নতুন জায়গা বলে সমীরণের ঘুম আসছে না। মীরাদের বাড়ীতে তার একটা অভ্যেস হয়ে গেছলো কিনা !…এখানকার ঠিকানাটা কালকেই মীরাকে জানাতে হবে। কথা দিয়ে এসেছে সে! না-রাখাটা ঠিক হবে না।…

পরদিন সন্ধ্যার পর সমীরণ গঙ্গার ঘাট থেকে বেড়িয়ে মেসে এসে আলো জেলে মীরাকে একখানা চিঠি লিখতে বসলো। মীরাকে তার বর্ত্তমান ঠিকানা জানাতে যদি বা মনে মনে কোন আপত্তি ছিল, আজ গঙ্গার ধারে বসে মনে মনে চিন্তা করবার পর সে সন্দেহ তার মন থেকে একেবারেই চলে গেছে। কাগজ কলম টেনে নিয়ে প্রথমে সে লিখলো—সুচরিতাসু। তারপর সেটা কেটে দিল। বড্ড বেশী গুরুগিরি দেখানো হচ্ছে। অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়ে সে ভেবে আবার লিখলো—প্রিয় বান্ধবী। বেশ শুনতে হয়েছে এবার শব্দটা! সমীরণ তন্ময় হয়ে লিখে চললো—

প্রিয় বান্ধবী,

অনেক দূরে চলে এসেছি ভবানীপুর থেকে; একেবারে বাগবাজারে। এখানে এসে যে মেসে উঠেছি তার নম্বর হচ্ছে ৭১।ডি, বাগবাজার ষ্ট্রীট। চমৎকার নির্জ্জন অথচ শান্তিময় পাড়া। সকলের সঙ্গে সকলে বেশ সহজ সামাজিকতার সুরে কথাবার্ত্তা কয়। আমি তেতলার যে ঘরখানায় থাকি—তাতে দুটিমাত্র সীট্। একটিতে থাকে অবনীদা, আর একটিতে আমি।

অবনীদাকে তুমি চেনো না বুঝি? অবনীদা পাড়াগাঁয়ের ছেলে, কোলকাতায় চাকরী করে, বেশ হাসিখুসি মানুষটি। আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে। দেশে অবনীদার মা আছে, দুটি অবিবাহিতা বোন আছে, আর বৌ আছে। সে নাকি কাজ করবার জন্য অবনীদাদার সংসারে এসেছে। রাত্রে আমার মাথার কাছের জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ে বালিশে,—পাঁচিলের ওপার থেকে হাস্নুহানার গন্ধ ভেসে আসে,—আমার তখন তোমাকে মনে পড়ে। আসবার দিন তোমার চোখে জল দেখে এসেছিলাম তাই!

বেবীদি আশা করি বেশ সেরে উঠেছেন। তাঁর ওপর আমার কোন রাগ নেই। আমি ঠিক করেছি, কারুর ওপর রাগ করবো না। যতদিন এখানে থাকবো চাকরী বা টুইশনির চেষ্টা করবো, না যদি পাই তবে আবার পাটনা চলে যাব্রো। তোমাদের বাড়ীতে বেশ ছিলাম,—এখানেও বেশ আছি। ইতি

সমীদা

কলমটা নামিয়ে রেখে সমীরণ চৌকীর ওপর শুয়ে পড়লো, তারপর বললো আঃ! চাঁদ উঠেছে, হাস্নুহানার গন্ধটাও আসছে। চাঁদের সঙ্গে হাস্নুহানার নিশ্চয় কোন সম্বন্ধ আছে। গন্ধটা যেন কী একটা নেশার মতো! আঃ!

চন্দ্রালোকিত আকাশের দিকে চোখ রেখে শুয়ে শুয়ে সমীরণ ভাবতে লাগলো কোলকাতার আকাশে একটাও পাখী নেই, আছে কেবল ধোঁয়া আর ধুলো, চিমনি আর চীৎকার। এই আকাশে যদি আজ ডাকতো কোন 'বউ কথা কও' তবে এই জ্যোৎস্নার একটা অর্থ হোত। কোলকাতার আকাশে চন্দ্রোদয়

একটা প্রচণ্ড রকম অপব্যয়। কোন লোক এখানকার চাঁদের জন্য ব্যস্ত নয়। তারা চায় না চাঁদকে। চাঁদের কোন প্রয়োজনই নেই তাদের জীবনে। এই যে দক্ষিণ-সমীরণ-লাগা হাস্নুহানার মৃদু সুগন্ধ—কেউ কি আজ নিচ্ছে একে নিঃশ্বাস ভরে! এক জানালা দিয়ে ঢুকে আর এক জানলা দিয়ে বিরাট ব্যর্থতার বোঝা বুকে নিয়ে এ যাচ্ছে বেরিয়ে। মানুষ এখানে বড় ব্যস্ত। এক মুহূর্ত্তের জন্যও দাঁড়িয়ে তারা অনুকম্পাভরে ভেবে দেখবে না—গন্ধটা এল কোত্থেকে?

—সমী! ঘুমিয়েছো নাকি? বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো অবনী। খট্ ক'রে সে সুইচ্‌টা টেনে দিয়ে জামা ছাড়তে লাগলো। অবনীকে দেখে সমীরণ তৎক্ষণাৎ উঠে বসলো।

—বৌয়ের চিঠি এসেছে বুঝলে হে?

—তাই নাকি! তাহলে খাইয়ে দিন দাদা!

—খাওয়াবার ব্যাপারই বটে। টাকা পাঠাতে হবে, টাকা! মায়ের অসুখ, ডাক্তার দেখাতে হবে। প্রয়োজন না থাকলে কি আর বাড়ী থেকে চিঠি আসে? বিশেষ ক'রে প্রিয়ার চিঠি? নাও পড়না চিঠিখানা?

সমীরণ চিঠি নিয়ে পড়তে লাগলো বাঁকা বাঁকা অক্ষরে অত্যন্ত অশুদ্ধ বানানের সাহায্যে ভদ্রমহিলা যা জানিয়েছেন, তা এই—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

অনেক দিন তোমার কোন কুশলপত্রাদি পাই নাই, সত্বর পত্রোত্তরদানে চিন্তা দূর করিবা। এখানে মায়ের জ্বর ও কাসি, পয়সার অভাবে ডাক্তার দেখানো হইতেছে না, ছোট ঠাকুরঝির

"মনের কথা" একখানা টাঙ্গাইল শাড়ী কিনিয়াছে বলিয়া সে কান্নাকাটি করিতেছে, তুমি পত্রপাঠ কিছু টাকা পাঠাইলে মায়ের চিকিৎসা ও ছোট ঠাকুরঝির শাড়ীর বন্দোবস্ত হইবে। আমার প্রণাম জানিবা। ইতি—

হতভাগিনী—
নন্দরাণী

সমীরণ চুপ ক'রে সামনে চেয়ে বসে রইল। জগতের এই একটা দিক কেন এতদিন তার নজরে পড়েনি? এই চাওয়ার দিক. যে দিক দিয়ে মানুষের অর্থ আর পরমায়ু দিনে দিনে নিঃশেষিত হচ্ছে!—মায়া নেই, মমতা নেই, প্রেম, সহানুভূতি কিছু নেই—শুধু 'দাও দাও' এর যুক্তিহীন চীৎকার!—এবং আজ মাসের ১৯শে! মাইনের জন্য আরও বারোদিন অপেক্ষা করতে হবে। অবনী বললো।

—দাদা! সমীরণ ডাকলো।

—বল।

—কত টাকা আপনার এখন দরকার?

—অন্ততঃ গোটা পনেরোতো বটেই। অবনী বললো।

—তা হলে আমি এখন ওটা দিয়ে দি, পরে মাইনে পেলে আমাকে দেবেন! অবনী বিস্মিত চোখে সমীরণের দিকে চেয়ে রইলো।

...হাস্নুহানার গন্ধটা যেন আরও বেশী পাওয়া যাচ্ছে......

—কিন্তু কবে এ টাকা শোধ করতে পারবো, সে আমি বলতে পারছি না সমীরণ! অবনী কথাগুলোতে একটু জোর দিয়ে বললো।—তুমি হয়তো আমার মাইনে পাবার আশা ক'রে বসে

থাকবে, অথচ আমি তোমাকে দিতে পারবো না, এ রকম মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আমি দিতে রাজী নই।

সমীরণ খানিকক্ষণ অবনীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো, তারপর আস্তে আস্তে বললো,—আচ্ছা বেশ। তবে যখন সুবিধে হবে দেবেন।

—অসুবিধে হবে না তোমার?

—না!

—তাহ'লে দাও। সমীরণ উঠে সুটকেশ খুলে অবনীকে পনেরোটা টাকা দিলো। অবনী বললো—বাঁচালে!

রাত্রে শুয়ে সমীরণ ভাবতে লাগলো—অবনীকে সে বললো বটে অসুবিধে হবে না, কিন্তু সুটকেশে আর মাত্র তিনখানি দশটাকার নোট আছে। এ রকম ভাবে বসে খরচ করলে—একদিন নিশ্চয়ই ওটাকা ফুরিয়ে যাবে। তখনও কি অসুবিধে হবে না? হবে। কিন্তু টাকা না পেলে অবনীর যে পরিমাণ অসুবিধে হোত, তার চেয়ে কম হবে। সেটাই কি কম লাভ? এ সংসারে কারুর চাইতে কম অসুবিধে হওয়ার ভাগ্য নিয়ে আসা একটা পরম ভাগ্য। কাল সকাল থেকে সে নিশ্চয় চাকরীর খোঁজে বেরুবে। সে চমৎকার গান গাইতে পারে—লোকে বলে। একটা গানের টুইশনিও কি জুটবে না? তার চেয়ে কত অযোগ্য লোক এখানে ক'রে খাচ্ছে—আর সেই কি চিরকাল বসে থাকবে? না, ঈশ্বরের বিধানে এমন অনিয়ম নেই। সে চাকরী পাবে।...সমীরণ ঘুমিয়ে পড়লো।

## [ আট ]

অনেক রাত্রে সমীরণের ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল।—জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলো—পশ্চিম দিগন্তে চাঁদ হেলে পড়ছে,—রাত চলেছে ভোরের দিকে গড়িয়ে। পাশের ঘরে চক্রবর্ত্তী আবার গোঙাচ্ছে। রাত্রি দশটার পর থেকে তার সেই অ্যাপেণ্ডিক্সের ব্যথাটা আবার দেখা দিয়েছে, তারই জন্যে...। কী বিশ্রী লাগে এই শেষ রাত্রের নির্জ্জনতায় কোন মানুষের রোগযন্ত্রণার কাতরানি শুনতে। এই নিরবচ্ছিন্ন আর্ত্তনাদে বোধকরি ঈশ্বরেরও ঘুম ভেঙ্গে যায়। চক্রবর্ত্তী লোকটি কিন্তু বেশ হাসিখুসী। অল্প পয়সা রোজগার ক'রে বেশী আনন্দ পেতে এই একটি মাত্র লোককেই দেখলো সমীরণ! দেশে ওর বাপ আছেন, মা আছেন, ভাই বোন সবাই আছে, বছর খানেক হ'ল বিয়ে করেছে সেই স্ত্রীও আছেন। কিন্তু এখানে ওর কেউ নেই। এই বিশাল জনারণ্যে ওর আপনজন নেই। এই ব্যথায় ও সারারাত চীৎকার করবে, ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগলে হয়তো তখন একটু ঘুমুবে। সেবা করা চুলোয় যাক্—এমন একটা লোকও ওর কাছে নেই যে গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেয়। এ অবস্থায় চেঞ্জে গেলে ওর খানিকটা উপকার হতে পারে। কিন্তু তারও উপায় নেই, বাড়ীতে টাকা পাঠাতে হবে। টাকা-টাকা-টাকা। সমীরণের মাথার মধ্যে ঝম্ ঝম্ ক'রে বাজতে লাগলো ওই শব্দ। সবাই চায় টাকা। মা, বাপ, ভাই, বোন, বন্ধু-বান্ধবী প্রিয়া—সবাই চায় টাকা। দিতে যদি পার—তবেই তোমার

প্রতি আমাদের দরদ—নইলে অমন ছেলে বাঁচার চাইতে মরাই ভাল!…আচ্ছা তারও যদি ওই রকম যন্ত্রণা দেখা দেয় কোন রাত্রে? যদি জ্বর হয়? তবে? সেও কি কাতরাবে নাকি—একলা পড়ে ওই রকম ভাবে? পাশের বেডের অবনীদা হয়তো—সে সময় দেশে থাকবে ছুটিতে, যেমন গেছে দেশে চক্রবর্ত্তীর রুম-মেট,—তবে কী করবে সে?

অকস্মাৎ বিদ্যুচ্চমকের মত সমীরণের মনে হ'ল,—না, সে কোলকাতায় একা নয়,—মীরা রয়েছে ভবানীপুরে! তাকে ডাক দিলেই সে ছুটে আসবে—নিশ্চয় ছুটে আসবে। বিনা দ্বিধায় সে সমীরণের জ্বরতপ্ত মাথাকে তুলে নেবে নিজের কোলে,—আস্তে আস্তে তার নরম আঙুলগুলি দিয়ে সে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে। এই ঠিক। এ ভুল হতে পারেই না।··আসবার সময় সে মীরার চোখে জল দেখে এসেছে, সে তো মিথ্যা নয়। মীরা তার বন্ধু, সে কত সুন্দরী! কই মীরার মত সুন্দরী আর একটিও মেয়ে তো তার চোখে পড়লো না!…ওঃ! মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে। দুই কাণের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করছে। সমীরণ উঠে বাইরে গিয়ে চোখে মুখে আর ঘাড়ে জল দিয়ে এলো।

…মা…মাগো…

নাঃ! অসহ্য! দেখতেই হ'ল চক্রবর্ত্তীকে। ধীরে ধীরে সমীরণ গিয়ে পাশের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াল।

—নরেশদা!

—কে? বিকৃত কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এল।

—আমি সমীরণ। খুব কষ্ট হচ্ছে দাদা?

— হ্যাঁ। ঘরের মধ্যে একবারটি এসোনা ভাই। হাঁপাতে হাঁপাতে চক্রবর্ত্তী বললো।

—কী বলুন? বলে সমীরণ ঘরের মধ্যে ঢুকে সুইচ্ টেনে দিলো। দেখা গেল চক্রবর্ত্তী চৌকীর উপর পড়ে ছট্ফট্ করছে,— বিছানা-বালিশ সব তচনচ হয়ে গেছে। ভদ্রলোক অফিসের জামাকাপড় ছাড়বার অবকাশ পর্য্যন্ত পায়নি।

— আমায় একটু জল দেবে ভাই?

—নিশ্চয়! সমীরণ কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে তার মুখের সামনে ধরতেই সে এক চুমুকে সবটা খেয়ে নিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। সমীরণ গ্লাসটা মাটিতে নামিয়ে রেখে চক্রবর্ত্তীর শিয়রের কাছে বসে তার মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে লাগলো। এই শুশ্রূষার স্পর্শ পেয়ে চক্রবর্ত্তী যেন একটু শান্ত হয়ে এলো। আধ ঘণ্টা পরে দেখা গেল সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আহা, নরেশদা বড় অসহায়! প্রবাসে মানুষের এই অবস্থাটা বড় করুণ। বিজ্ঞান এত করলো – কিন্তু এই রোগটাকে পৃথিবী থেকে তাড়াতে পারলো না। কত রকমের রোগযন্ত্রণায় যে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে! সামনের ডাক্তারখানাটায়, সমীরণ সকালবেলায় জানালা দিয়ে বসে বসে দেখে, ভীড়ের আর অন্ত নেই। রিক্সা ক'রে, মোটরে ক'রে, ঘোড়ার গাড়ী ক'রে, দলে দলে আসছে লোক; কী ক্লান্তি তাদের চোখেমুখে! প্রণাম ভগবানকে— কোলকাতায় এসে অবধি সমীরণের একদিনের জন্য মাথাটা অবধি ধরেনি।···চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছেতো! ভোর হচ্ছে বুঝি? সমীরণ ঘুমে ঢুলতে আরম্ভ করলো এবং একটু পরে পাশের খালি চৌকীটার উপর গিয়ে গা এলিয়ে দিতেই তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে

পড়লো। চক্রবর্ত্তী ঘুমোচ্ছে, সমীরণও ঘুমোচ্ছে। ভোরের প্রথম কাক ডেকে উঠলো, বড় রাস্তায় জল দেওয়ার শব্দ হচ্ছে। রোগের ও সান্ত্বনার রাত্রি প্রভাত হ'ল।

বেলা প্রায় আটটার সময় সমীরণের ঘুম ভাঙ্গলো। পাশের বিছানার দিকে চেয়ে দেখলো চক্রবর্ত্তী নেই। এক মিনিট পরেই চক্রবর্ত্তী স্নান করে ঘরে এসে ঢুকলো।

—একি! আপনি কি অফিস যাচ্ছেন নাকি?

—হ্যাঁ। ন'টায় অ্যাটেণ্ডান্স। চক্রবর্ত্তী বললো।

—আজকের দিনটা রেষ্ট নিলে পারতেন। সমীরণ মৃদুকণ্ঠে বললো।

—পাগল! চক্রবর্ত্তী হেসে উঠলো। ত্রিশ টাকা মাইনের আবার রেষ্ট কী হে! বড়সায়েব বেটা যা পাজী, হয়ত মাইনেই নেবে কেটে। আমি ভালই আছি সমীরণ। সামনে পূজো কত দায়ীত্ব মাথার উপরে, এখন কামাই করা চলে না। চক্রবর্ত্তী মাথা আঁচড়াতে লাগলো।

সারাদিন সমীরণ কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো চাকরীর খোঁজে। কিন্তু ঘুরলো কেবল রাস্তায়। কোন বাড়ীতে ঢুকলো না, কারুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো না, এমন কি যে কাঠের কারখানার দেওয়ালে "Wanted a clerk" লেখা ছিল সেখানেও না। যেন রাস্তায় চাকরী তার জন্ম অপেক্ষা করছে—আর একটু জোর পায়ে হেঁটে গেলেই তার সাক্ষাৎ মিলবে।

সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত হ'য়ে সমীরণ আবার সেই চায়ের দোকানে এসে বসলো।

সন্ধ্যে হয়েছে অনেকক্ষণ। গ্যাসের নীচে একটি ঘোমটা-

ঘেরা মেয়ে একটি মাস দশেকের ছেলে কোলে নিয়ে হাত পেতে বসে আছে। সামনের ডাক্তারখানা থেকে একটা আর্ত্ত-চীৎকার ভেসে আসছে। বোধ হয় অপারেশন হচ্ছে।

প্রকাণ্ড একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। ভেতর থেকে মেয়েলি গলা শোনা গেল ৭১।ডি, নম্বরটা দেখতো ড্রাইভার! ড্রাইভার গাড়ী থামিয়ে নেমে গেল। হঠাৎ গাড়ীর জানলা দিয়ে একখানা ধব্‌ধবে সুন্দর মুখ আলোতে বেরিয়ে এল।

—মীরা! উন্মাদের মত সমীরণ কাপটা ঠেলে ফেলে দিয়ে এক লাফে রাস্তায় নেমে পড়লো।—মীরা! মীরা! এই যে আমি—এখানে! ছুটে সমীরণ গাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, তৎক্ষণাঃ দরজা খুলে একটি সুন্দরী তরুণী রাস্তায় নেমে পড়লো এবং সমীরণের হাত দুটো প্রবল বলে নিজের হাতে চেপে ধরলো।

—মীরা!

—সমীদা! বড্ড রোগা হয়ে গেছ?

আশ্চর্য্য! মীরা কাঁদছে!—তোমার চিঠি পেয়ে আমি থাকতে পারলাম না সমীদা, তাই চলে এলাম।

দুজনে দুজনের হাত ধরে সেই মাঝ রাস্তায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

—সমীদা!

—কি মীরা?

—ভাল আছ? মীরার স্বর কান্না-করুণ।

—হ্যাঁ। সমীরণের চোখেও জল।

মীরা রুমাল বার করে আস্তে আস্তে নিজের চোখ দুটো মুছে ফেললো।

[ নয় ]

হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সমীরণ আর মীরা। কণ্ঠ ভ'রে আছে এতদিনের অকথিত বাণীর অব্যক্ত বেগ। প্রশ্নের পর প্রশ্নের তরঙ্গ—নিঃশব্দে এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে ওদের দুজনেরই নিঃসাড় মনে ; কিন্তু হায়, কে করবে প্রশ্ন ? সমীরণ ? হায়, হায়,—তাহলে আর ওকে নিয়ে উপন্যাস সৃষ্টির মত একটা অবাঞ্ছিত অসম্ভব কাজ করতে যাবো কেন ? চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে মীরার চোখের দিকে ও চেয়ে রইল।

—চল সমীদা কোথাও গিয়ে একটু বসি ! মীরা বললো।

—হ্যাঁ, তাই চল।

দুজনে চলতে আরম্ভ করলো। দু'পা এগিয়ে গিয়ে সমীরণ ল্যাম্প পোষ্টের তলায়, ছেলে কোলে নিয়ে হাত পেতে বসে আছে, সেই মেয়েটির হাতে একটা সিকি ফেলে দিলো। হঠাৎ যেন সমীরণ আজ অত্যন্ত বদান্য হয়ে উঠেছে। অবিশ্যি ভিখারীকে পয়সা দেবার প্রবৃত্তি ওর এই নতুন নয়। কিন্তু ভিক্ষা দেবার ওর একটা মটো আছে। সেটা এই, যে ভিখিরী সিন্সিয়র নয় তাকে ও পয়সা দেবেনা। তার মানে ভিক্ষে করা তার প্রফেশান। সেই প্রফেশানকে ও প্রশ্রয় দেবেনা। এমন কি সে যদি সত্যিকারের ভিখিরী হয়—তবুও না।

—ভিক্ষে দিলে ? মীরা পথ চলতে চলতে তরল কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ। বিরক্তিভরা সুরে সমীরণ জবাব দিলো।—না দিয়ে

করি কি ? একটা কচি ছেলেকে সামনে রেখে ভিক্ষে চাওয়াটা বর্ব্বরতা—প্রকাণ্ড রকম ভাল্‌গার। কিন্তু মনের মধ্যে এমন একটা ধাক্কা দেয়—বোগাস্‌!

মীরা মনে মনে একটু হাসলো। কারণ সমীরণের স্বভাবের সঙ্গে ও সম্পূর্ণরূপে পরিচিত। ও জানে সেন্টিমেন্ট নিয়ে সমীরণের কারবার। জীবনের মূলধনে কিঞ্চিৎ সেন্টিমেন্ট ছাড়া আর কিছুই নেই ওর। এ নিয়ে সমীরণ মুখে যতই দম্ভ করুক—ওই ওর একমাত্র দুর্ব্বলতা। মীরা জানে—সব জানে।

কিন্তু সমীরণের আজ হলো কি ? সমস্ত পথটায় সে অনর্গল কথা কইতে কইতে চললো। মীরা কিন্তু এর কোন একটি কথারও জবাব দিলো না। কারণ সে জানে, যে এনার্জি সমীরণ আজ পথে অকারণে খরচ করে ফেলছে, পার্কের নির্জ্জন প্রান্তে গিয়ে তা আর সে ফিরে পাবে না। এই মীরার অদৃষ্ট, এই বিধিলিপি।

কোলকাতার সন্ধ্যা। পথের দুধার দিয়ে কাতারে কাতারে লোক চলেছে—শোভাযাত্রার মত। সার্কুলার রোড দিয়ে গিয়ে দুজনে মোহনলাল ষ্ট্রীটে পড়লো। তারপর শ্যামলাল ষ্ট্রীট ;—তারপর রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট। সমীরণ তখন বলছে—জানো মীরা ! আসলে আমরা নিজেকে যত একলা ভাবি, বাস্তবিক পক্ষে আমরা তা নই। নইলে দেখোনা, তোমাদের বাড়ী ছেড়ে যখন বাগবাজারে এসে পা দিলাম মনে হল আর বুঝি কোলকাতায় টিঁকতে পারবো না। কিন্তু দেখতে দেখতে বন্ধু গেল জুটে। বেশ আছি এখন।

—বেশ আছ না সমীদা ! অত্যন্ত আস্তে মীরা জিগ্যেস করলো।

—হ্যাঁ বেশ আছি। গলায় জোর দিয়ে সমীরণ বলতে আরম্ভ করলো।—আমাদের মেসটা মোটের ওপর ভালই। তার কারণ যে কজন লোক এখানে বাস করে তারা সকলেই দরিদ্র, কাজেই বেশ শান্ত।

—দরিদ্র হ'লেই বুঝি শান্ত হ'তে হয়?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। কারণ বিষদাঁত থাকেনা। ওদের প্রয়োজন কম তাই আয়োজনও কম। এই তো সেদিন আমি একজনকে কয়েকটা টাকাই ধার দিয়ে ফেললাম।

মীরা থমকে দাঁড়িয়ে বললো—তুমি আজকাল টাকাও ধার দিচ্ছ নাকি সমীদা?

—না, না, ধার ঠিক নয়, সমীরণ যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েছে মনে হল। তার মাইনে পেতে দেরী ছিল ছিল কিনা তাই—।

—আমায় কিছু ধার দেবে সমীদা! মীরা তার ডান হাতটা পাতলো।

—তোমাকে! সর্ব্বনাশ! ঠাট্টা করছো মীরা?

—না ঠাট্টা নয় সমীদা। সত্যিই আমাকে ধার দেবে কিছু? টাকা-কড়ি নাই বা দিলে, অন্য কিছু ধার দাও?

—অন্য কিছু? সমীরণ যেন একটু চিন্তায় পড়েছে। সেই সনাতন বোকামি আবার তাকে পেয়ে বসলো বুঝি! কী অন্য কিছু মীরা?

—যাহোক্ কিছু, যা হোক কিছু দাও। অনেককে তুমি ঋণী করেছো এই পৃথিবীতে। আমাকেও ঋণী কর সমীদা! আমি তোমার কাছে ঋণী হ'তে চাই। মীরার স্বরে একটা অদ্ভুত কাতরতা।

—ঋণী হ'তে চাও? অদ্ভুত আইডিয়া তোমার! সমীরণ হাতের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্রশ্নটাকে মন থেকে দূর ক'রে দিল।

দুজনে গিয়ে মাঠের মাঝখানে অন্ধকার জায়গাটায় কোমল ঘাসের উপর বসলো। ঠিক মাঠের মাঝখানটা বেশ নির্জ্জন।

মীরা অতদূর থেকে তাকে দেখতে এসেছে, অনজ সমীরণ অনেক কথাই তাকে বলবে। অনেক ভাল ভাল কথা, অনেক গভীর কথা। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্ত্তেই সে কথাগুলো মনে আসছে না তো! প্রথম দর্শনের আনন্দের ধাক্কাটা কেটে গেলেই বলাটা সহজ হয়ে যাবে, এটা সমীরণ জানে।

—আমাদের কি একেবারে ভুলে গেছো সমীদা? মীরা উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

—না, ভুলিনিতো। ভুলবো কি রকম?...তোমাকে তো আমার খুব মনে পড়ে। সমীরণ আবার আবোল তাবোল সুরু করলো। না, মীরা, ভুলিনি। রাত্তিরে যখন আমার ঘরে জ্যোৎস্না এসে পড়ে, আর বাতাসে হাস্নুহানার গন্ধ একটু একটু ক'রে পাওয়া যায় তখনই আমার তোমাকে মনে পড়ে। ওঃ! কী ভয়ানক মনে পড়ে তখন তোমায়! মনে হয় যদি দুটো ডানা থাকতো তবে সাঁ ক'রে উড়ে গিয়ে তোমাকে দেখে আসতাম।

—মানুষের তো ডানা থাকেনা সমীদা, তার আছে পা—তাই তাকে হেঁটে হেঁটে প্রিয়সন্দর্শনে যেতে হয়। এই নিয়ম। পা যদি না থাকতো—

—খুব মুস্কিল হতো। সমীরণ মীরাকে থামিয়ে দিয়ে আরম্ভ করলো।—ভয়ানক মুস্কিল হতো। এই দেখনা কেন, সেদিন হেদোর কাছ দিয়ে আসছি, হঠাৎ দেখি এক ভদ্রলোক স্রেফ্ একখানা

পা তার হাঁটু অবধি কাটা, পয়সা চাইলে! শুনলাম বাড়িতে নাকি তার স্ত্রী-পুত্র রয়েছে, তারই রোজগারে তারা বেঁচে আছে। বল্লাম-বন্ধু! একি পরিহাস করেছে বিধাতা তোমার সঙ্গে? দুখানা পায়ের একখানা কেড়ে নিয়ে কাঁধে চাপিয়েছে চারটি ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীর ভরণপোষণ! ঠাট্টারও তো একটা সীমা থাকা দরকার! কি বল মীরা?—

—হ্যাঁ। খুব আস্তে মীরা উত্তর দিলো।

—আমি লক্ষ্য করেছি, অত্যন্ত অস্থানে আর অসময়ে মাঝে মাঝে রসিকতা করেন এই ভগবান ভদ্রলোকটি। আমাদের পাড়ায় একটি অন্ধ আর তার স্ত্রী আছে, সেদিন শুনলাম তাদের একমাত্র ছেলে, যে সবে একটা চায়ের দোকানে চাকরী ক'রে দৈনিক চার আনা রোজগার করছিল, রাস্তায় বাস চাপা পড়ে মারা গেছে। বারে মজা! কোটি কোটি টাকা আর অগণিত পরিজন যাদের, তাদের সঙ্গে এই ধরণের ইয়ার্কী বুঝি জমেনা, না?

—তুমি থামো! মীরা কেঁদে ফেলেছে। একি কেবল তোমারই চোখে পড়ে? আর কিছুই কি তুমি দেখতে পাওনা? এই যে জগত জুড়ে মানুষ হাসছে, খেলছে, গান গাইছে,—একি তুমি দেখতে পেলে না? দেখলে কেবল দুঃখ, কেবল ব্যথা, কেবল দারিদ্র্য?

—হ্যাঁ, তাই আমি দেখেছি। সমীরণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কোথায় তোমার হাসি, গান আর উৎসব চলছে, আমায় বলতো মীরা! সে করছে কারা? তোমরা যারা রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছ—তাদেরই এ সব চালবাজি। তোমরা সংখ্যায় কত কম—কত তুচ্ছ—সে খবর রাখো?

—তুমি কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাও সমীদা ? এই জন্যেই কি আমি আজ বাগবাজারে এলাম ? মীরার কণ্ঠে করুণ কাকুতি।

—হ্যাঁ, এইজন্যেই এসেছো তুমি, এখন বুঝছি ! তোমাদের সুখৈশ্বর্য্য ছেড়ে আমি আজ কী কষ্টে এখানে কাল কাটাচ্ছি তাই দেখতে এসেছ তুমি ! তুমি আমার দারিদ্র্যকে উপভোগ করতে এসেছ না ? কিন্তু শুনে রাখো আমি এখানে অত্যন্ত সুখে আছি—অত্যন্ত সুখে। এত সুখ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। তোমাদের ওই মুখোস-পরা ভদ্রতা আর এটিকেটের কবল থেকে পালিয়ে এসে বেঁচেছি আমি।

মীরার পক্ষে আত্মসংবরণ করা ক্রমেই কঠিন হ'য়ে পড়ছিল, এইবার সে হু হু ক'রে কেঁদে উঠলো। কী অবিশ্রান্ত সেই কান্না সমীরণ হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেল, কিছুক্ষণ সে বুঝতেও পারলো না— মীরা কাঁদছে কেন ! কাঁদতে কাঁদতেই মীরা উঠে পড়লো, তারপর সোজা গেটের দিকে চলতে আরম্ভ করলো। সমীরণ চললো তার পেছনে পেছনে হতভম্বের মত।

নীরবে দুজনে এসে মোড়ে বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছে দাঁড়ালো। সমীরণ কী করবে, কিছুই ভেবে স্থির করতে না পেরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েই রইল ; এবং একটু পরেই নিজের অজান্তে বলে উঠলো—ওই বাস আসছে !

—হ্যাঁ, যাচ্ছি আমি। মীরার স্বর কান্না-ভারাক্রান্ত। আমি আর তোমার সুখে থাকার সময় নষ্ট করতে আসবোনা সমীদা ! কিন্তু—কিন্তু কী ভীষণ ভুল তোমার ! আমি এসেছিলাম কি না তোমার দারিদ্র্য উপভোগ করতে ! কি করে বলতে পারলে এ কথা তুমি ?

বাস এসে সম্মুখে দাঁড়াতেই মীরা সমীরণের মুখের দিকে চেয়ে বললো—চল্লাম সমীদা! তোমার দারিদ্র্য আমি উপভোগ করতে আসিনি—আমি এসেছিলাম তার ভাগ নিতে। আজ পেলাম না, কিন্তু একদিন নিশ্চয় পাবো। মীরা বাসে উঠে পড়লো। সমীরণ শক্-খাওয়া মানুষের মত ক্যাল ক্যাল ক'রে তার দিকে চেয়ে রইলো।

ডবার ঘণ্টা দিয়ে বাস কণ্ডাক্টার হাঁকলো—ঠিক্ হায!

[ দশ ]

সেইদিন রাত্রে—

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সমীরণের মনের ভিতরটা হাহাকার ক'রে উঠলো। হাস্নুহানার মৃদু সুগন্ধের সঙ্গে একথা মনে হ'ল যে, মীরাও ঠিক এই সময়টায় তার তেতলার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চুপ ক'রে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। চোখের দু কোণে দু ফোঁটা জলের আভায়,—প্রিয়-প্রত্যাখ্যাতা কুমারীর নির্ব্বাক বেদনার সাক্ষী!

একথা মনে করলে সমীরণের পক্ষে অন্যায় হবে যে মীরা তাকে ভালোবাসে না। মীরার ভাল না বাসবার কোন প্রমাণই তার হাতে নেই; যে প্রেম আঘাতের পরিবর্ত্তে প্রত্যাঘাত করে না— সেই তো প্রকৃত প্রেম! না, না, খুবই অন্যায় করেছে সে আজ মীরাকে তিরস্কার ক'রে। চোখের জলে মীরা বিদায় নিয়েছে, হয়তো আর সে আসবে না কোনদিন; ম্লান পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় আজ সমীরণ একথা অত্যন্ত অকস্মাৎ আবিষ্কার করলো যে জগতে রমণীর প্রেম দুর্ল্লভ বস্তু। প্রেম হচ্ছে জীবন-মহীরুহের দুরায়ত্ত ফল; গাছের নীচে দাঁড়িয়ে লোলুপ নেত্রে তার দিকে চেয়ে থাকলে তোমার পাওয়ার-একাগ্রতা হয়তো প্রমাণিত হবে, কিন্তু তাতে পাওয়া হবে না। সেই ফল যদি আস্বাদ করতে চাও তবে ওঠো সেই গাছের কণ্টকাকীর্ণ শীর্ষে, আরোহণ ক'রে আহরণ

করো। নইলে সে ফল চিরকাল তার মনোহারী রূপ নিয়ে তোমার চোখের সামনে দুলবে অথচ ধরা দেবে না।

না, কালই সে যাবে ভবানীপুরে, গিয়ে বলবে—মীরা! আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি; আমায় তুমি ক্ষমা করো। তোমার প্রেম আমি সত্য বলে বুঝতে পেবেছি, আর তাকে ফিরিয়ে দেবার আমার সাহস নেই; তাই আমি এসেছি মীরা, আমাকে তুমি নাও। এই কথা শোনবার পর মীরার মুখে দেখা দেবে ক্ষীণ একটি হাসির রেখা, গাল দুটি হয়ে উঠবে রক্তাভ, ধীরে ধীরে সে মাথা নীচু করবে। কালই যাবে সমীরণ! মীরা যদি তার জন্য সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে, তবে সেই বা পারবে না কেন নিজেকে প্রস্তুত রাখতে!

খুব সকালেই সমীরণের ঘুম ভাঙলো। চোখ মেলে দেখতে পেলো অবনীদা ব্যস্ত হ'য়ে সুটকেশ গুছোচ্ছে।—ব্যাপার কী?

—আমি বাড়ী চল্লাম, সমী! বৌয়ের খুব অসুখ! অবনীদা বললো।

—সে কি! কী অসুখ করলো হঠাৎ?

—তা বলতে পারছি না। তবে শুনলাম নাকি মরে যাবে; তা' ও যদি মরেই যেতে পারে, তাহ'লে আমি কি একবার দেশে যেতে পারি না? তা ছাড়া—

—চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি নাকি?

—কী জানি! হয়ত হয়েছে, হয়ত হয় নি, তা নিয়ে মাথা ঘামানো বিড়ম্বনা। বাপ-মা আদেশ দিয়েছিলেন বিয়ে করতে, করেছিলাম বিয়ে—এখন যদি মরে যায়, তাহ'লে আবার অপেক্ষা করবো বাপ-মায়ের হুকুমের জন্য! কী বল?

—ছি, ছি আপনি উতলা হবেন না অবনীদা। আমি বলছি বৌদি ভাল হয়ে যাবে।

— দেখা যাক। বলে অবনী ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল।—হ্যাঁ, আর একটা কথা, তোমার টাকাটা আমি তো শোধ ক'রে যেতে পারলাম না, পরে চেষ্টা করবো।'

—না-না-তাতে কী! তুচ্ছ টাকা ক'টার কথা এখন আর আপনাকে ভাবতে হবে না। কখন আপনার ট্রেণ? .

—দশটা পাঁচিশে। আচ্ছা চলি।

আজ সকালেই সমীরণ মেস থেকে বেরোলো। বেরবার সময় উদ্দেশ্য ছিল একটা চাকরীর চেষ্টায় কয়েক জায়গায় যাবে, কিন্তু পথে বেরিয়ে আর সে কথা তার মনে রইল না!

অবনীদা কিন্তু খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। হবারই কথা; স্ত্রীটি যদি ওর সত্যি মরে যায়, তাহ'লে কি হবে বেচারার? গ্রাম্য স্ত্রী, আর তার তো কোন গুণই ছিল না। শুধু মুখটী বুঁজে নীরবে সংসারের কাজ করে যেতো, আর মাঝে মাঝে শাশুড়ীর কাছে শুনতো তিরস্কার। চোখে হয়ত জল আসতো কিন্তু সে জল গোপনে মুছে আবার দিতো কাজে মন।

এই তো আমাদের বাংলা দেশ! দরিদ্র বাপ-মায়ের সংসার থেকে দরিদ্রতম স্বামীর ঘরে প্রবেশ। অনাহার, অনিদ্রা, আর হাহাকারের রাজপথ বেয়ে কোনরকমে জীবনটাকে সমাপ্তির সীমায় এনে ফেলা! এই তো জীবন! জাগতিক দুঃখ ভোগের শেষ মীমাংসা হচ্ছে মৃত্যু!

অবনীদা কাঁদবে, খুবই কাঁদবে! নিরহঙ্কার, সরল, অবনীদা, মাসিক ত্রিশ টাকা রোজগারে যে প্রতিপালকের গর্ব্ব অনুভব

করে সংসারে তারও ব্যাঘাত আসবে! তার টাকাটা অবনীদা দিতে পারলো না! না পারুক,—কিন্তু সমীরণ চায় যে ওর স্ত্রী ভাল হয়ে উঠুক।···টাকা আর তার বাক্সে নেই বল্লেই হয়, যা আছে তা দিয়ে বড় জোর আর মাসখানেক মেসে বাস করা চলতে পারে। কিন্তু তারপর?

তারপরের কথা আর সমীরণ ভাববে না। এই পথের ধারে সারি সারি যারা হাত পেতে বসে আছে, হাসপাতালে যারা মৃত্যুর অপেক্ষা করছে, তারা তো তারপরের কথা ভাবে না। তবে সেই বা ভাববে কেন? দরকার নেই—তারপর ভেবে!

দু পয়সা দিয়ে একটা কমলানেবু কিনে খেতে খেতে সমীরণ পথ চলতে লাগল।···কিছুই করতে পারবে না সে? এই উদ্দেশ্য-বিহীন পথচলার কী সার্থকতা আছে! কদিন চলবে এ ভাবে? নিজের অক্ষমতার বেদনায় সমীরণের চোখে জল দেখা দিল।

অনেক দূর চলে এসেছে এমন সময় হঠাৎ ওপর থেকে সে একটা সুমিষ্ট কণ্ঠের ডাক শুনতে পেলো—সমীদা!

—কে? চমকে সমীরণ পেছন ফিরে চেয়ে দেখলো ডান-দিকের বাড়ীটার দোতলা থেকে একটি তরুণী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে!

—সমীদা!—তরুণীটি আবার তাকে ডাকলো।

—রে-বা! সমীরণ বিস্ময়ে চীৎকার ক'রে উঠলো। তুমি! তুমি—কোলকাতায়!

—ভেতরে এস! রেবা বললো।

সমীরণ! একটু আস্তে হাঁটো,—দৌড়ে গিয়ে লাভটা কী আমায় বলতে পারো? যেহেতু রেবা তোমাকে ডাকছে—

সেহেতু দৌড়তে হবে—এর কোন মানে হয়না। কারণ রেবা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে, মাঝে থেকে তুমি হোঁচট খেয়ে পড়ে হাত-মুখ ভাঙবে, অতএব আস্তে চলো লক্ষ্মিটী! আস্তে চলো! সমীরণ! জীবনে সরল হওয়াটা সব সময় সারল্য নয়, অনেক সময় ওটা মূর্খতারই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। যে কেউ যেখান থেকে হাতছানি দেবে—সরল বিশ্বাসে অমনি তুমি তার দিকে ঢলে পড়বে—এতো ভাল কথা নয়! রেবা হতে পারে তোমার বান্ধবী-সখী—প্রিয়তমা; হতে পারে তোমার বাল্যজীবনের স্বপ্নসাথী, কিন্তু তবুও এ হচ্ছে সহর কোলকাতা, এখানকার পরিস্থিতিতে কী রূপ নিয়ে ও বিরাজ করছে—সে কথা একটু বিচার কর মনে মনে! অন্ততঃ তার কাছে পৌছবার আগে মনে মনে তাকে একটু অবিশ্বাস ক'রে যাও! তবেই দেখতে পাবে তার স্বরূপ! নইলে তুমি যাওয়া মাত্র যদি সে তোমার এই মুগ্ধবোধের মত চেহারা দেখে—তবে তার ছলনা তুমি ধরতে পারবেনা। নানা রকমে সে তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে! তোমারই চোখের সামনে তোমাকে প্রতারণা করবে যে, সে তোমাকে ভালবাসে। এমন ভালই বাসে যা জগতে আর কেউ কারুকে বাসেনি বা বাসতে পারেনি।

## [ এগারো ]

বাড়ীর চৌকাট পেরিয়ে সমীরণ ভেতরে ঢুকলো। দোতলার সামনের রেলিং ধরে রেবা দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই সহাস্যময়ী ব্রীড়াবনতা রেবা। কপালের কাছে চুলগুলো হয়ে আছে এলো-মেলো, বড় বড় চোখ দুটো ঈষৎ রক্তাভ,—রেবা বড় হয়েছে! বেশ বড় হয়েছে! সমীরণের বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগলো। রেবার কি তবে বিয়ে হয়ে গেছে? তাহ'লে এখানে কি রেবার শ্বশুর বাড়ী? কিন্তু আর কারুকেত দেখছিনে! পাটনা থেকে এল কবে রেবা? মা কেমন আছেন?

—ডাইনে সিঁড়ি! মধুর কণ্ঠে রেবা বললো।

—সমীরণ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আরম্ভ করলো।...মীরার সঙ্গে রেবার অনেক তফাৎ; সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে কে বড়—সে কথা বলা বড় কঠিন। তবে রেবা, মীরার মত অভিমানী কিম্বা সেন্টিমেন্টাল নয় এ কথা সমীরণ জানে! কতদিন কতবার পাটনায় রেবার সঙ্গে তার ঝগড়া হয়ে গেছে—কত তুচ্ছ কারণে; কিন্তু কখনও রেবা মীরার মত কেঁদে আকুল হয়নি। চোখের জলের ব্যবসা যে সব মেয়ে করে—রেবা তাদের দলে নয়।

—এই যে! এস সমীদা! থাকতে থাকতে কোথায় যে ডুব মেরেছিলে তার ঠিক নেই! কেমন আছ?

—ভাল আছি। তুমি?

—আছি একরকম। ভাগ্যি দেখতে পেয়েছিলাম তোমাকে!

—তুমি হঠাৎ কোলকাতায়—!

—বলছি সে কথা। ঘরে চল সমীদা! এমনভাবে পরের মত—ছাদে দাঁড়িয়ে দুটো মৌখিক আলাপ ক'রে বিদায় নিলেতো চলবেনা!

— কী করতে হবে?

—ঘরের মধ্যে গিয়ে বসতে হবে, তারপরে খেতে হবে; তারপরে গল্প করতে হবে সারাদিন—সারারাত্রি ধরে! রাজী?

—রাজী!

—তুমি একটুখানি বস, আমি তোমার চা ক'রে নিয়ে আসি! তর্‌তর্ ক'রে রেবা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

বাঃ! সমীরণ, বাঃ! কে বলে মেয়েদের কাছে তুমি লজ্জাবতী লতা,—যে বলে সে মূর্খ,—এইতো মহামহীরুহের মত রেবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছো। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলতো সমীরণ? রেবার সঙ্গে তুমি কিছুমাত্র রক্তিম না হ'য়ে কথা কইছো কী ক'রে! ও! রেবা পাটনার মেয়ে বলে বুঝি? দেশের মেয়ে? পাশের বাড়ীতে থাকতো? মাঝে মধ্যে ভালবাসাবাসির দু' চারটে ভাল কথাও হতো? ও! তা বেশ।

—এক কাপ চা হাতে নিয়ে রেবা ফিরে এলো। কাপটা সমীরণের সম্মুখে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললো—

—কই, তুমি দেশের আর কারুর কথা জিগ্যেস করলে না সমীদা?

—হ্যাঁ, এই করি! মা কেমন আছেন?

—কার মা?

—তোমার!

—নেই। মরে গেছেন। রেবা ম্লান হেসে জবাব দিলো।

—সেকি? সমীরণের যেন দম বন্ধ হয়ে এল। তোমার মা—!

হ্যাঁ মারা গেছেন। কী করবো বল; মার যখন অসুখ হলো তখন ব্যাঙ্কে যা কিছু ছিল—সব খরচ করেও বুঝতে পারলাম এত সামান্য দামে এ রোগ যাবেনা—তখন হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম; এবং হাল ছেড়ে দেবার পর নৌকা চলেনা, সে তো তুমি জানই।

—তবে তোমার বিয়ে বুঝি—

হঠাৎ সমীরণের দৃষ্টি পড়লো রেবার মাথায়। কই সিঁথেয় তো সিঁদুর নেই; কপালে শুধু ছোট্ট একটুখানি লাল ফোঁটা, তাকে তো এয়োতীর চিহ্ন কিছুতেই বলা চলেনা। তবে—?

—বল সমীদা, বিয়ের কথা কী বলছিলে?

—না—না—বলছিলাম যে তোমার বিয়ে তবে—

—কবে হ'ল? এই কথা? কিন্তু সে বিরাট কাহিনী এখনি তুমি নাই বা শুনলে সমীদা! পরে আমি তোমাকে সবই বলবো। কিন্তু তুমি কি আজ খাওয়া দাওয়া করবেনা? নাইবেনা? চল! আশ্চর্য্য! এতদিন পরে কোলকাতায় তোমায় দেখতে পেলাম—কিন্তু এখনও তুমি সেই ছেলে মানুষটিই রয়ে গেছো! কোন পরিবর্ত্তনই তো হয়নি তোমার! কেন?

—কী জানি! কিন্তু তুমি কি এখানে একলা থাকো রেবা? বাড়ীতে আর কাউকেতো দেখছিনে!

—ঠিক তাই। আমি একলাই থাকি! দুঃখ ক'রেতো কোন লাভ নেই সমীদা, একলাইতো থাকতে হয় মানুষকে!

—তা হয়! সমীরণ বহু কষ্টে কথা কইতে পারলো।—কিন্তু এত বড় বাড়ীতে একলা—মানে অভিভাবক কেউ নেই—

—তাইতো অভিভাবকের পথ চেয়ে বসে ছিলাম এতকাল। এইবার এসেছে আমার অভিভাবক—আরতো আমার ভয় নেই! তোমাকে এতকাল পরে ফিরে পেলাম, আনন্দ আমার কোথায় রাখবো সমীদা! কতদিন মনে হয়েছে তোমার কথা, কতদিন কেঁদেছি একলা ঘরে চুপি চুপি তোমাকে দেখবার জন্য, কিন্তু কোথায় তুমি আছো না জানার জন্য কিছুই করতে পারিনি।... চল সমীদা নাইবে চল!

খাওয়া দাওয়ার পর বিকেল বেলায় সমীরণের ঘুম ভাঙ্গলো। নরম বিছানা, মাথার উপর ঘুরছে ফ্যান। পথ ভোলা একটি ভ্রমর ঘরের মধ্যে অকারণে গুণ্ গুণ্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মধুর আলস্যময় একটি পরিবেশ। জীবনটাকে এক-জায়গায় বসিয়ে শুধু স্বপ্নরচনা করা ছাড়া আর যেন কোন কাজ নেই।

কত কথাই যে মনে পড়ছে আজকে! রেবার স্বহস্তে পাতা বিছানায় শুয়ে আজ শুধু রেবারই কথা মনে পড়ছে সমীরণের। পাটনার বাড়ীতে এই রকম বিকেল বেলায় রেবা কীভাবে সেজে-গুজেই না তার কাছে আসতো! পরিপাটি ক'রে খোঁপাটি বাঁধা, কপালে ছোট্ট একটি কালো টিপ, মুখখানি প্রসাধনের পর অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখাতো। হাতে দুগাছি ক'রে সোণার চুড়ি, গলায় সরু একটি বিছে হার। তার বড় বড় চোখ দুটোর দিকে চাইলেই সমীরণের মনে হতো—সে যেন এই মাত্র সরু ক'রে কাজল পরে এসেছে। সেই রেবা,—সেই মদালসা রেবার ঘরে আজ সে কিনা অতিথি হয়ে দিবা নিদ্রা উপভোগ করলো!

ঘর—? হঠাৎ সমীরণেব মনে হ'ল—ঘর! কার ঘর? রেবার? তাই যদি হয়, তবে কি রেবা এখানে একলা বাস করে? কিন্তু—। তাইবা কী ক'রে সম্ভব! রেবার মত পরমাসুন্দরী ষোড়শী তরুণী কোলকাতায় বাস করছে একা, এ কথাতো স্বপ্নেও ভাবা যায় না। না—না—এ হতেই পারেনা! রেবা নিশ্চয়ই এখানে কোন অভিভাবকের কাছে থাকে। না,—এ হ'তেই পারে না!

—ঘরময় মৃদু একটি সুগন্ধ ছড়িয়ে রেবা এসে সমীরণের বিছানার পাশে বসলো। কী অপরূপই না দেখাচ্ছে আজ ওকে। আগের চাইতে ওর সৌন্দর্য্য ঢের বেশী বেড়ে গেছে।

—সমীদা। রেবা মিষ্টি ক'রে ডাকলো।

—কী রেবা?

—বিকেল হয়ে গেছে উঠবে না?

—এই উঠি।

—বেড়াতে যাবে কোথাও?

—না।

—সিনেমায় যাবে?

—না।

—তবে?

—আমি একবার মেসে যাব।

—তা বেশ, আমার সঙ্গেই চল গাড়ীতে। মেস থেকে তোমার জিনিপত্র তুলে নিয়ে—বেড়িয়ে টেড়িয়ে একবারে বাড়ী ফেরা যাবে।

—তার মানে? সমীরণ বিস্মিত হ'য়ে বললো।

—তার মানে? রেবা হেসে উঠ্‌লো।—তার মানে মেসে আর তোমাকে থাকতে দেওয়া হবে না সমীদা! এবার থেকে তুমি আমার কাছেই থাক্‌বে। অনেক কান্না কেঁদেছি তোমার জন্য, কিন্তু আর আমি কাঁদবো না।

—কাঁদাবে বুঝি? সমীরণ রসিকতার চেষ্টা করলো।

—ঠিক তাই। কিসে মানুষ কাঁদে সে কথা আমার কাছে না থাকলে তুমি বুঝবে না। কিন্তু আর দেরী নয়—ওঠো। লক্ষ্মী ছেলের মত বাথরুম থেকে মুখ হাত ধুয়ে এসো; তারপর জামা কাপড় পরে নিয়ে আমার সঙ্গে চল! ওঠো!

—কিন্তু রেবা, তুমিতো আমাকে বললে না যে এখানে তুমি আছো কার কাছে।

—শয়তানের কাছে! হলোত! পারিনে বাবা তোমার সঙ্গে বকর্ বকর্ করতে। বলছি যে সব কথা রাত্তিরে খুলে বলবো; তখন শুনো পেট ভরে। কিন্তু তর সইছেনা নয়? এখন ওঠো—বেরুবে না?

ধীরে ধীরে সমীরণ বিছানা ছেড়ে উঠে মুখ হাত ধুয়ে এল। তারপর জামাটা গায়ে দিয়ে রেবার সঙ্গে নীচে নেমে এসে দেখলো —প্রকাণ্ড একখানা নতুন মোটর দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ড্রাইভার গাড়ী থেকে নেমে রেবাকে সেলাম ক'রে দরজা খুলে ধরলো। রেবা গট্ গট্ ক'রে ভিতরে গিয়ে বসলো—তারপর সমীরণের দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি ক'রে বললো—আঃ! তবুও দাঁড়িয়ে রইল! এসো! সমীরণ ভেতরে ঢুকতেই গাড়ী ছেড়ে দিল!

হু হু ক'রে গাড়ী গিয়ে বাগবাজার ষ্ট্রীটের মেসের কাছে দাঁড়ালো। সমীরণ অত্যন্ত বাধ্য ছেলের মত নেমে গিয়ে,

স্যুটকেশটা নিয়ে এলো। মেসের ম্যানেজার বোধ হয় ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিল, তাই গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়াতেই সমীরণ স্যুটকেশ খুলে একখানা দশ টাকার নোট তার হাতে দিয়ে বললো,—পাওনা হয়নি তা' জানি। তবু দিয়ে গেলাম; আমাকে মনে রেখো। আর দেখো—অবনীদা যদি আসে তবে তাকে বোলো—না, থাক আমিই আসবো। আচ্ছা চলি তবে!

—ওকি! সমীদা! তুমি কি কাঁদছো নাকি? এই মরেছে! রেবা ঠাট্টা ক'রে উঠলো।

—না ও কিছুনা—এমনি। সমীরণ কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিলো একবার।

সমীরণ! এমন আড়ষ্ট হ'য়ে বসে কেন তুমি? হ'ল কি তোমার হঠাৎ? রেবা কত সহজে গাড়ীর মধ্যে তার গা এলিয়ে দিয়েছে তাকি তুমি দেখতে পাচ্ছো না? মনে কর সেই রাত্রির কথা,—যে রাত্রিতে বেবী তোমাকে ডায়মণ্ড হারবারের পথে নিয়ে গিয়ে তোমার হাতে চুমো খেয়েছিল। বেবী তোমাকে ভালবাসতো কিনা, তার কোন প্রমাণ নেই, তাই সে তোমাকে ভালবাসার কথা বলতে বাধ্য করেছিল! কিন্তু আজ? আজও কি তেমনি ভাবেই এই প্রমোদ ভ্রমণটিকে নষ্ট করবে? এতো বেবী নয়, এ রেবা! বেবী চেয়েছিল তোমাকে, আর তুমি চেয়েছিল রেবাকে! সেই রেবা—সেই পাটনার রেবা,—ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তুমি যাকে স্বপ্ন দেখা অভ্যেস করেছিলে।...তার কাছে আর একটু ঘেঁসে বসো সমীরণ! তার সুরভিত-সজ্জার স্পর্শ লাগুক তোমার গায়ে, আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে উন্মুক্ত হোক্ তোমার তৃতীয় নয়ন!

রাত্রি প্রায় ৯টার সময় দুজনে বেড়িয়ে ফিরলো। রেবা উপরে যেতে যেতে বলে গেল—ঠাকুর! আমাদের খাবার দিয়ে যাও। তারপর ঘরের মধ্যে এসে সমীরণের দিকে চেয়ে বললো—নিশ্চয় ভয়ানক খিদে পেয়েছে—না সমীদা!

—না তেমন নয়, তবে—সমীরণ সঙ্কোচে থেমে গেল। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়—খিদেয় সে দাঁড়াতে পারছিলো না, কিন্তু তবু স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ হচ্ছিল। রেবা যদিও তার একান্ত আপন জন; মানে রেবা ছাড়া কোলকাতায় আর তার চেনা লোক যদিও নেই,—তবুও এই সামান্য খাবার ব্যাপার নিয়ে নির্লজ্জতা প্রকাশ করাটা উচিত নয়।

—দেরী করোনা মুখ ধুয়ে এস। আমারও ভয়ানক খিদে পেয়েছে।

খেতে বসে সমীরণ রেবাকে প্রশ্ন করলো—গাড়ীখানা কার রেবা? চমৎকার গাড়ীখানা কিন্তু!

—বন্ধের। তুমি এখন কথা না কয়ে আগে খেয়ে নাওতো। পরে ওসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

অদ্ভুত স্বভাব হয়েছে আজকাল রেবার। যে কোন প্রশ্নই ও সুকৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছে। বারে মজা! সমীরণ চিন্তিত মনে লুচি ছিঁড়তে লাগলো। কিন্তু সেই উজ্জল-আলোকিত কক্ষে হতভাগ্যের এ ব্যাপারটা একবারও চোখে পড়লো না যে রেবা আড়চোখে তার দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে হাসছে। দুর্জ্ঞেয় এবং দুর্বোধ্য সেই হাসি……।

রাত্রি গভীর হয়েছে। সমীরণ রেবার খাটে একলা শুয়ে

ঘুমোচ্ছে। মাথার উপর পাখাটা ঘুরছে অন্ধকারের মধ্যে তারই শুধু একটা একটানা শব্দ। রেবা কোথায় শুয়েছে, তা সমীরণ জানেনা। রেবা তাকে যাবার সময় বলেছিল—এই তোমার বিছানা শুয়ে পড় চুপ ক'রে। রাত্রে জল খাওয়া অভ্যেস আছে তোমার। ওই জলে রইলো তোমার মাথার কাছে। যদি ভয় করে রাত্রে—আমাকে ডেকো আমি ওই পাশের ঘরেই রইলাম। মাঝের দরজাটা খোলাই রইল—কেমন ?

হঠাৎ সমীরণের ঘুম ভেঙ্গে গেল। কোনই কারণ ছিলনা ঘুম ভাঙ্গবার। কিন্তু—না, অন্ধকার ঘরে তার মাথার কাছে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে, স্পষ্ট তার মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কে ? সমীরণ বলতে চেষ্টা করলো কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলনা। গলাটা ভাল ক'রে পরিষ্কার নিয়ে সমীরণ আবার বললো—কে ?. ভয়ে তার সমস্ত শরীর ভারী হ'য়ে উঠেছে।

—আমি সমীদা, ভয় নেই। ঘুমোও! উত্তর এল।

—রেবা ? এতরাত্রে ? আলোটা জ্বেলে দাও রেবা!

—আলো থাক সমীদা—এইতো বেশ।

—না, না আলোটা জ্বেলে দাও,—সমীরণ জোর দিয়ে বলে উঠলো।—তোমার পায়ে পড়ি রেবা, আলোটা জ্বেলে দাও।

—ছি ছি সমীদা, বড় লজ্জায় ফেলতে পার তুমি মানুষকে। দিচ্ছি আলো জ্বেলে অধীর হোয়োনা! রেবা বললো।

রেবা আলো জ্বেলে দিয়ে আবার দ্বিতীয়বার সমীরণের পাশে এসে বসে বসলো। সমীরণ বিমূঢ়ের মত তার চোখের দিকে চেয়ে বললো—

—কি ব্যাপার রেবা ?

—গুরুতর কিছু নয় সমীদা। তুমি তখন শুনতে চেয়েছিলে না—যে মা মারা যাবার পর আমি কি করলাম ? সেই কথাই তোমাকে বলতে এলাম।

—ও ! সমীরণের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। এই কথা ! এই সামান্য কথাটা কাল সকালেও তো বলা চলতো রেবা ! শুধু শুধু এই রাত্রে কষ্ট ক'রে –

—না কষ্ট নয় ! শোন ! মা মারা যাবার পর সংসারে আমি একলা। মাঝে মাঝে তোমার মায়ের কাছে গিয়ে শুয়ে থাকতাম তাতে একলা থাকার ভয়টা ভাঙতো বটে, কিন্তু একাকীত্বের ভয়তো ভাঙতো না। কী কষ্টে ছিলাম আমি ভাবতে পারো সমীদা !

—হুঁ ! সমীরণ বললো।

—এমনি সময় দৈববানীর মত আমাদের বাড়ীতে এলো আমারই এক অতি দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই। আমার নিরবলম্ব জীবনে সে আনলো আশ্বাস, সে আনলো আশ্বস্তি। সে বললো—এখানে একলা থেকে কোন লাভ নেই। আমার সঙ্গে চলো কোলকাতায়,—সেখানে গিয়ে আমাদের কাছে থাকবে।

—তারপর ?

—তারপর বিনা দ্বিধায় চলে এলাম কোলকাতায় তার সঙ্গে। কত আশা কত আনন্দ—কত আকাঙ্ক্ষা ! সে নিয়ে এসে ওঠালো—আমায় এই বাড়ীতে। বললো আর কেউ এখানে থাকবেনা রেবা, শুধু তুমি আর আমি,—যেমন থাকে স্বামী-স্ত্রী।

— তারপর ? আশঙ্কায় সমীরণের চোখ বড় হয়ে উঠেছে।

-- বুঝলাম বিপদে পড়েছি — কিন্তু কীইবা আমি করতে পারি তার বিরুদ্ধে! অতএব বাস করাটাকেই স্বীকার ক'রে নিলাম, স্বীকার করে নিলাম তার সমস্ত গোপনতা, কদর্য্যতা, আর তার পাপ।

—রে-বা! সমীরণ চীৎকার ক'রে উঠলো!—এ-সব কী বলছো তুমি? তুমি কি আমায় আরব্য-উপন্যাস শোনাচ্ছো?

—চুপ ক'রে শোন সমীদা! শেষ হয়নি এখনও আমার কথা!—মাসখানেক এমনি ভাবে বেশ গেল। তারপর একদিন বেড়াতে গিয়ে আর সে ফিরলোনা।·· এইখানে রেবা চুপ করলো। তারপর ম্লান হেসে তার কথা শেষ করলো—রূপ আর বয়স দুটোই ছিল অনুকূল, অতএব আশ্রয়দাতার অভাব ঘটলোনা। শুনলেতো সমীদা আমার পাটনা ভাগের কাহিনী? বুঝলেতো এবার, এখানে আমি থাকি কার কাছে?

সমীরণের বুকের মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণা হতে লাগলো। কী ভীষণ সেই যন্ত্রণা। রেবা,—তার স্বপ্ন-সঙ্গিনী রেবা তবে এখন—! এত সুলভ-মূল্যে সে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে! পাপের গভীরতম অতলে আজ ডুব দিয়েছে, কিন্তু কী পেলো সে? ছি-ছি-ছি-ছি! ওই হাতে সে সমীরণের হাত ধরেছে, তাকে খাবার দিয়েছে, করেছে তাকে সেবা, ভ্রমণ করেছে এক-সঙ্গে এক গাড়ীতে!

গভীর রাত্রের নির্জ্জন ঘরে দুজনে মুখোমুখী চুপ ক'রে বসে রইলো। বক্তব্য শেষ হ'য়ে যাওয়ার ক্লান্তি ফুটে উঠেছে রেবার

মুখে চোখে,—আর সুহৃঃসহ সংবাদের অপ্রত্যাশিত আঘাতে সমীরণ হ'য়ে পড়েছে মুহ্যমান।

দেয়াল ঘড়িতে টং…টং…ক'রে দুটো বাজলো।

হঠাৎ সমীরণ খাট থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে পড়লো। তার মুখে চোখে একটা ভয়াবহ আতঙ্কের ছবি। রেবা বললো—

—কোথায় যাচ্ছো সমীদা ?

—আমি চলে যাচ্ছি। আমি এখানে থাকবো না।—না, না আমি এখানে থাকবো না।

—দাঁড়াও! রেবা ধীরপদে উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো, তারপর সমীরণের দিকে ফিরে বললো—বসো ওই খাটে চুপ ক'রে! ছেলেমানুষি সব সময় ভালো নয় সমীদা! বসো! সমীরণ আবার খাটের উপর বসে পড়লো।

—না—না—আমি যাব, আমাকে যেতে দাও। মৃদুস্বরে বললো সমীরণ।

—দেবইতো! চিরকাল তোমাকে আটকে রাখতে পারি— এমন বাঁধনই বা আমার কোথায়? কিন্তু এই গভীর রাত্রে আমিতো তোমাকে একলা ছেড়ে দিতে পারি না সমীদা। আজ অন্ততঃ তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।·· সমীরণ রেবার মুখের দিকে চেয়ে হতভম্বের মত বসে রইল।

—সাধু পুরুষ! পাপীর কাছে এসেছ—তাকে ত্রাণ করতে বুঝি? শুধু ত্রাণই করবে—তার পাপের ভাগ নেবেনা?

—না—না—

—কী না না? রেবা ধমক দিয়ে উঠলো।—তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু; তোমার কথা ভেবে ভেবে কত দুঃখ আমি

পেয়েছি,—মায়ের বারণ না মেনে তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে কত তিরস্কার খেয়েছি,—আজ কিন্তু তারা কেউ নেই। আছি শুধু তুমি আর আমি। তোমাকে আমি ছেড়ে দেবোনা সমীদা!

—না, আমি যাই! সমীরণ কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো।

—আবার বলে যাই? রেবা ফট্ ক'রে সুইচটা টেনে ঘর অন্ধকার করে দিয়ে খিলখিল ক'রে উঠলো হেসে। অন্ধকার ঘর থেকে শুধু সমীরণের ক্রন্দন-জড়িত কণ্ঠ শোনা গেল! সে স্বরে কী অসহায়তা আর কী মিনতি—

—তোমার পায়ে পড়ি রেবা,—আলোটা জ্বেলে দাও। তোমার পায়ে……!

হায় সমীরণ! ঘরের বাইরে জেগে রইল ধ্যানমগ্না তাপসী নিশীথিনী, ঊর্দ্ধে জেগে রইল লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র রাজি, ভবানীপুরে জেগে রইল অভিমানিনী মীরা, দেশে জেগে রইল মুমূর্ষ স্ত্রীর পাশে তোমার অবনীদা,—আর তুমি—!

হায় সমীরণ!

## [ বারো ]

লাঞ্ছনার ও লাঞ্ছিতের রাত্রি প্রভাত হলো। পূর্ব্বগগনে দেখা দিলো উষার আরক্তাভা। নীড়ের পাখী তার দুই ডানা মেলে দিয়েছে আকাশে। কোলকাতার আকাশে—যার চতুর্দিগন্ত কয়লার ধোঁয়ায় ধূসর!

রেবার বাড়ীর সদর দরজা খুলে চুপি চুপি চোরের মত চারদিক চাইতে চাইতে সুটকেশ হাতে একটি ছেলে বেরিয়ে এল। সমীরণ! একি চেহারা হয়েছে তোমার? ঝড় খাওয়া বনস্পতির মত তোমার সৌন্দর্য্য গেছে মলিন হয়ে। চোখ দুটো নিষ্প্রভ, ঠোঁট সাদা,—চুলগুলি অবিন্যস্ত,—গালের উপর সুস্পষ্ট জলের রেখা! কী হ'ল তোমার সমীরণ? রেবা তোমার বাল্য সহচরী,—যাকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তুমি স্বপ্ন দেখা অভ্যেস করেছিলে; সেই রেবার অতিথি হ'য়ে—তুমি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় রাত্রি যাপন করেছো, আহার করেছো চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়! এত সুখ তোমার সইল না? ভোর বেলায় কেউ না জাগতে, কারুকে না জানিয়ে, এ কোথায় চলেছ তুমি? অভিমান হয়েছে? কিন্তু অভিমান কার ওপর করছো তুমি? এ তোমার বেবীদি নয়, মীরা নয়, এযে রেবা! প্রবাসের প্রতিটি মুহূর্ত্ত ভ'রে অবিরাম যার সঙ্গ কামনা করেছো তুমি! শুনবেনা আমার কথা? যাবেই চলে এখান থেকে? তবে—আচ্ছা চল! আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি!

সমীরণ দ্রুতপদে গঙ্গার দিকে চলতে লাগলো। বোঝা গেল এখনও তার চোখ থেকে সম্পূর্ণ জলটা বেরিয়ে যায়নি, থেকে

থেকে এখনও কানায় কানায় ভরে উঠছে।...সমস্ত শরীরের স্নায়ু তন্ত্রীগুলো মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে,—প্রচণ্ড ভূমি-কম্পের পর আতঙ্কিতা বসুন্ধরার মত !

অবশেষে—অবশেষে এই তার অদৃষ্টে ছিল ! সমস্ত মন আর দেহ ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়ে কি আনন্দ পায় মেয়েরা ?—পৃথিবীর আদিকাল থেকে এই যে ক্রমাবর্ত্তিত গতানুগতিক ইতিহাসের ধারা কোনকালেই কি এর কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হবে না ? পঙ্কিল কামনা-কলঙ্কিত আত্মতৃপ্তির মধ্যেই কি মানুষের জৈব লীলার শেষ কথা নিহিত রয়েছে !

সামনেই গঙ্গা,—সমীরণ বাঁয়ে ফিরে দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলো। না, আর সে কোলকাতায় থাকবে না। আর সে থাকতে চায়না এই সুসভ্য রাজধানীতে, সত্য আর সুন্দরের যেখানে স্থান নেই, পাপ আর মিথ্যাচার যেখানে তাদের রাজত্ব বিস্তার করেছে !

মীরার কথা মনে পড়ছে। সান্ত্বনাময়ী মৃদুভাষিণী মীরা ! তার দুর্ব্ব্যবহারে যে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিয়েছে। বলে গেছে—আমি এসেছিলাম তোমার দুঃখের ভাগ নিতে ! আজ পেলাম না কিন্তু জানি একদিন নিশ্চয় পাবো। মীরা হচ্ছে দরিদ্রের জীর্ণ ঘরের শীর্ণ প্রদীপ শিখা। রূপের অহঙ্কারে সে উগ্র উজ্জ্বল নয়, নিজের ক্ষীণ আলোটুকু বিতরণ করে যে লজ্জায় বিনম্র। কিন্তু রেবা ? সমীরণ আবার মনে মনে শিউরে উঠলো। এই যদি রেবার প্রেম হয় তবে কোথায় তফাৎ তার সঙ্গে বেবীদির ? যার আত্ম নিবেদনে নেই কোন শালীনতা, লোকে তাতেই তো বলে রূপোপজীবিনী ! রেবা রূপোপজীবিনী, বেবীদিও রূপোপজীবিনী,

ধর্ম্মে ওরা দুজনেই এক। প্রেবকে লাঞ্ছিত করার মধ্যে আছে ওদের একটি আদিম উল্লাস। সেই উল্লাসকে চরিতার্থ করবার জন্য ওরা খুঁজে বেড়ায় শিকারের পর শিকার। তাদের রক্তাক্ত বক্ষতলে পা দিয়ে দিয়ে ওরা সৃষ্টি করে চলে নিজেদের যাত্রাপথের বিজয়-অভিযান! ওঃ!

অকস্মাৎ সমীরণ আবার কাঁদতে আরম্ভ করলো। না-না, আমি আর থাকবোনা কোলকাতায়। আমি চলে যাবো—এখান থেকে দূরে—বেবা আর বেবীদির বাহুবিস্তারের বাইরে! আরোগ্য হয়ে উঠুক অবনীদার স্ত্রী, সুখী হোক অবনীদা, সুখী হোক মীরা, সুখী হোক শৈলেন,—সুখী হোক কোলকাতার আত্ম-সর্ব্বস্ব নাগরিকের দল,—সুখী হোক হেদোর সেই খোঁড়া ভিক্ষুক অভিভাবক,—সুখী হোক গ্যাস-পোষ্টের তলায় হাত পেতে বসে থাকা সেই সন্তানবতী ভিখারিণী,—সবাই সুখী হোক,—সকলেই থাকুক কোলকাতায়। শুধু সেই থাকবেনা, তার জন্য নগর নয়, নয় সভ্যতা, নয় প্রেম, নয় বেবীদি, নয় বেবা,—বিদায়!

কেঁদোনা সমীরণ! চেয়ে দেখ এই সেই হাওড়ার পুল! আশাকরি এই হাওড়ার পুল সম্বন্ধে ব'য়ে পড়ে নিশ্চয় অনেকবার একে দেখতে প্রলুব্ধ হয়েছিলে তুমি! চেয়ে দেখ সমস্ত পুলটা কতকগুলো নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাল ক'রে চেয়ে দেখ! বাঁয়ে চাও, সারি সারি বিরাটকায় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। ওদের কেউ এসেছে লণ্ডন থেকে, কেউ নিউইয়র্ক, কেউ সাংহাই, আবার কেউ বা কামস্কাট্‌কা থেকে। ওরাও

তোমারই মত সবে কোলকাতায় এসেছে। কিন্তু দেখ ওরা তোমার মত ভীরু নয়!

কেঁদোনা সমীরণ! এ তোমার পশ্চিম নয়, এ হচ্ছে বাঙলার রাজধানী! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সহর। এখানে প্রত্যেকটি দোতলা, তিনতলা, চারতলা বাড়ীর ঘরে ঘরে গিজ্ গিজ্ করছে মানুষ, তাদের কেউ কারুকে চেনেনা। তারা ন'টার সময় নাকেমুখে ভাত গুঁজে উর্দ্ধশ্বাসে ট্রামে উঠে আর একটা তিনতলা কি চারতলা বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢোকে, তারপর সেখান থেকে বেলা পাঁচটার সময় বেরিয়ে আবার নিজের দোতলা কি তিনতলায় এসে ঢোকে, এই হচ্ছে এখানকার সভ্যতা!

কেঁদোনা সমীরণ! এদের জীবনে এই ন'টা-পাঁচটার পরের বৈচিত্র্য হচ্ছে, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া···নবজাত শিশুর কান্না··নশার ডাক···মাতালের চীৎকার ··· কলেরা ···বসন্ত···টাইফয়েড · দমকলের দাম্ভিক গর্জ্জন···এ্যাম্বুলেন্সের নিঃশব্দ যাতায়াত···কলার খোসা···আমের খোসা···নাক ডাকার শব্দ···

কেঁদোনা সমীরণ! চলো!

## সুশীল দাসগুপ্তের প্রকাশিত

### —আরও কয়েকখানি বই—

১। দুই পুরুষ ( Fathers and Children )

আইভ্যান টুর্গেনিভ

অনুবাদক—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

দাম—২৲ টাকা।

২। পরমভৃষা ( Great Hunger ) হোয়ান বোয়ার

অনুবাদক—মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

দাম—২৷৵০ আনা।

৩। সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর যাত্রী—ইভান বুনিন,

অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য্য

দাম—১৷০ আনা।

—যন্ত্রস্থ—

৪। জাঁ ক্রিস্‌তফ্‌—রঁম্যা রোঁলা

অনুবাদক—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

সত্যেন্দ্র ভূষণ বিশ্বাস

প্রতিখণ্ড—২৲ টাকা।

—যন্ত্রস্থ—

৫। অজানিতার চিঠি—ষ্টিফান স্যাইগ্‌

অনুবাদক—বিধায়ক ভট্টাচার্য্য,

দাম—১৲ টাকা।

—যন্ত্রস্থ—